# পরিচয়

মে-জুন ১৯৫০ | নব পর্যায় : ৫ম সংখ্যা | বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৭



দাম : আট আনা

# সূচীপত্র

পৃষ্ঠা





# পরিচয়

বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ : ১৩৫৭

## পাশ্চাত্যের লেখকদের কাছে খোলা চিঠি

—ইলিয়া ইরেনবুর্গ

বিশ্বশান্তি সম্মেলনের স্থায়ী পরিষদের তৃতীয় অধিবেশন সবে শেষ হ'ল। যাঁরা এই অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলেন, তাঁরা এক আবেদন পেশ করেছেন। এই আবেদন সুষ্ঠু চেতনাসম্পন্ন সমস্ত পুরুষ আর নারীর কাছে। আজকের আন্তর্জাতিক উত্তেজনার উৎপত্তি সম্পর্কে তাদের যে-মতই থাক না কেন, তাঁরা স্পষ্টই অতিমাত্রায় চঞ্চল হয়ে উঠেছেন, সমস্ত জাতিগুলির ভিতরে শান্তিপূর্ণ-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জন্য তাদের অধীর উৎকণ্ঠাও দেখা দিয়েছে।

যাঁরা এই অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলেন তাঁরা এক আবেদনে স্বাক্ষর করে এই মর্মে প্রস্তাব করেন যে, যাঁর সততা আছে, তিনি তা-ই করবেন। আবেদনের বিবরণ উদ্ধৃত করছি।

জনগণের উপর আক্রমণের এবং তাদের জীবননাশের সুপরিকল্পিত অস্ত্র হিসেবে আণবিক অস্ত্রকে নিষিদ্ধ করা হোক—এই দাবিই আমরা করছি। এই সিদ্ধান্ত কার্যকরী করবার জন্য তার উপর কঠোর আন্তর্জাতিক শাসনের দাবি জানাচ্ছি। যে কোনো দেশের উপর যে সরকার প্রথমে আণবিক অস্ত্র ব্যবহার করবে, সে যুদ্ধপাপী বলেই বিবেচিত হবে। তাই শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের আমরা এই আবেদনে স্বাক্ষর করবার জন্য ডাকছি।

পাশ্চাত্যের বহু লেখক এরই মধ্যে এই আন্দোলনে স্বাক্ষর করেছেন। যাঁরা এখনও ইতস্তত করছেন, তাঁদের কানে কানে বলা হচ্ছে যে, এই শান্তির স্বপক্ষে তাদের আবেদনের আড়ালে আছে কূট রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র—

তাদেরই উদ্দেশ্যে আমি বলছি। তাদের একথা বোঝানো হচ্ছে যে, শান্তির
পায়রা কুখ্যাত ট্রয়ের ঘোড়ারই সামিল।

কেন লেখকদের কাছে আমার এই আবেদন। প্রধানত আমি নিজে একজন
লেখক, তাই। আমি জানি যে, একজন লেখক তাঁর স্বাক্ষরের তাৎপর্য বোঝেন,
তিনি এও উপলব্ধি করেন যে, লক্ষ লক্ষ পাঠক আগ্রহভরে শোনেন তাঁর কথা।
তিনি তো শুধু আপাতকেই দেখেন না, ভবিষ্যৎদৃষ্টিও তাঁর আছে, তিনি তো শুধু
বর্ণনা করেন না, বিধানও দেন। তাঁর এক বিরাট দায়িত্ব, যে-লেখক জনগণের
উদ্দেশ্যে বলবেন, জনগণের দায়িত্ব তো তাঁরই উপর।

## লেখক দায়ী

যে লেখক একখানা বই লিখেছেন তার পূর্ববর্তীদের লেখা সবগুলি বই
সম্পর্কে তিনি দায়ী। পৃথিবীর সাহিত্য ভাণ্ডার, অতীতের মূল্যবান সম্পদের
জন্যও তিনিই দায়ী। যে লেখক সরল সহজ প্রেমের কথা বর্ণনা করছেন
পৃথিবীর সব প্রেমিক প্রেমিকা—সবগুলো দোলনা আর বালিকার জন্য তিনি
দায়ী। আজকের লেখকের পক্ষে কি লুকিয়ে থাকা সম্ভব—তিনি কি শিশুকে
ভুলতে পারেন, ভুলতে পারেন মানুষের সুখ, পুরনো বাড়ির পাথর আর সংস্কৃতির
ভাগ্যের কথা?

আমি লেখকদের কাছে এই জন্যেই আবেদন জানাচ্ছি যে, প্রতি লেখকের
স্বাক্ষরের অনুসরণ করবে তার পাঠকদের হাজার হাজার স্বাক্ষর। কেউ কেউ
হয়তো বিরুদ্ধেই বলবেন কোন স্বাক্ষরেই যুদ্ধ ঠেকিয়ে রাখা যায় না, বাঁচানো
যায় না মানবতাকে। কিন্তু এ ভিৎতো শক্ত নয়, লেখকের পক্ষে তা
অনুপযুক্তও বটে।

অতীতে বিচ্ছিন্ন শ্রেণীগুলি যুদ্ধ করত, কিন্তু আজ জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে,
সাধারণ মানুষের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যুদ্ধ বাধানো সম্ভব বলে আমি বিশ্বাস করি না।
তাই আণবিক অস্ত্রের নিন্দাসূচক এই আবেদনের নিচে যে স্বাক্ষরগুলি রয়েছে,
তারা তো মার্কিন, ইংরেজ, ফরাসী, ইতালীয়, পোল, চীনা আর ভারতীয়
নামের তালিকা কয়েকখানা শুধু কাগজ নয়। এই স্বাক্ষর এক সিদ্ধান্তের
কথাই বলছে, বলছে এক দৃঢ়সংকল্প আর শপথের কথা। সে-শপথ নিয়েছেন
লাখো লাখো মানুষ। আমরা জানি রাজনীতিজ্ঞদের কোন সাক্ষাৎকারেও আজ
পর্যন্ত কোনো ফল হয়নি (কারা তার জন্য দায়ী, সেকথা এখানে জোর করে



বলতে চাই না)। আমরা দেখতে পাচ্ছি নিরীহ মানুষের উপর আণবিক
অস্ত্রের হুমকি ক্রমাগত বেড়েই চলেছে, দেখতে পাচ্ছি, এক অপ্রত্যাশিত বিপদ
ঘনিয়ে এসেছে মানুষের সংস্কৃতির উপর।

পুরনো যুগের রোমের মানুষরা বলত: যখন অস্ত্র কথা কয়ে ওঠে, কলা-
লক্ষ্মীরা নীরব হয়ে যান। আজ কলা-লক্ষ্মীরা চেঁচিয়ে উঠুন, অস্ত্র যাতে মুখর
হয়ে না ওঠে, তাই চলুক অবিরত কথা।

## যাঁদের সততা আছে, এমন লেখকদের কাছে আবেদন জানাচ্ছি

পাশ্চাত্যের যে সব লেখক জীবনকে আমাদের থেকে পৃথকভাবে দেখেন,
যারা স্বতন্ত্রভাবে অনুভব বা চিন্তা করেন—তাঁদের কাছে জানাই আমার
আবেদন। আমার মতবাদের যারা অংশীদার তাঁদের কাছেই শুধু নয়, আমার
আবেদন পাশ্চাত্যের এমন লেখকদের কাছে, যাঁদের আছে সততা, যাঁরা
সমাজতন্ত্রী এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী, বস্তুতান্ত্রিক ও আধ্যাত্মবাদী, পুরনো
যুগের প্রতি মমতাময় এবং নতুন যুগের আবিষ্কর্তা।

এ প্রস্তাব আমি করি না যে, তাঁরা আমার সামাজিক, রাজনীতিক বা
নন্দনতাত্ত্বিক মতামতের ভাগ নিন। আমি এ কথাও বলি না যে তাঁরা একটি
রাজনীতিক দলের বিরুদ্ধে আর একটিকে সমর্থন করুন; এ প্রস্তাবও আমার নয়
যে, তাঁরা কোন সরকারকে তার স্বরাষ্ট্র বা পররাষ্ট্র নীতির জন্য নিন্দা করুন।

আমার প্রস্তাব সম্পূর্ণ বিভিন্ন, তারা গ্রহণও করতে পারেন। আমি প্রস্তাব
করি যে আণবিক অস্ত্র, বোমা আর অতি বোমা সব মানুষকে শাসাচ্ছে তারই
বিরুদ্ধে তাঁরা এসে দাঁড়ান। আমার প্রস্তাব এই যে, বিনাশর্তে আণবিক অস্ত্রের
নিষিদ্ধতা এবং তাকে সফল করার জন্য শাসনের প্রবর্তন—এই দাবিতে
শান্তির পুরোধাদের সঙ্গে তাঁরা মিলিত হোন। আমি এ কথাও বলি, যে সরকার
যে কোন দেশের মানুষের উপর আণবিক বোমা নিক্ষেপ করতে সাহসী হবে,
তাকে তারা নিন্দা করুন।

রাষ্ট্রী শান্তি পরিষদের তৃতীয় অধিবেশনে যে আবেদন গৃহীত হল, প্রচ্ছন্ন
হুমকি তাতে নেই, নেই কোন পক্ষপাতপূর্ণ নির্দেশ। আণবিক অস্ত্র উৎপাদনের
যে এতদিন ছিল কোন রাষ্ট্রের একক অধিকার হিসাবেও আর নেই।
এই আণবিক অস্ত্র নিষেধের কথা জানাতে গিয়ে এই দাবি আমরা

জানাচ্ছি যে সব রাষ্ট্রে এই অস্ত্র উৎপাদিত হচ্ছে বা হতে পারে সেইখানেই নিষেধাজ্ঞা জারী হোক। এতো রায় নয়, সতর্ক বাণী। এই আবেদনে স্বাক্ষর করে আমরা সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে উদ্দেশ্য করে জানাচ্ছি, যারা আমাদের এই নিষেধের দাবির বিরুদ্ধে দাঁড়াবে—সে হবে তাদের পাপ ষড়যন্ত্রেরই প্রকাশ। যারা এই অস্ত্র ব্যবহার করতে সাহসী হবে, তাদের দুষ্কৃতকারী বলে যারা নিশ্চিহ্ন করতে না চান—তাঁরা তো তাদের অমানুষিক অভিসন্ধিরই প্রকাশ করলেন—হাঁ, এই আমার বিশ্বাস।

তাই পাশ্চাত্যের লেখক, তোমাদের আমি ডাকছি—আমাদের এই মানবতার দ্বারা উদ্বুদ্ধ, সভ্যতার জন্য শংকান্বিত পক্ষপাতহীন আবেদনে তোমরা সমর্থন কর।

পাশ্চাত্যের কয়েকজন লেখকের কথা আমার মনে আছে। তাঁরা মানুষের এই ধ্বংসের প্রতি সহানুভূতি দেখাতে পারেন নি—কিন্তু আমার যতটুকু মনে পড়ে তাঁরা এখনো আণবিক অস্ত্রের বিরুদ্ধে এগিয়ে আসেন নি। আমি তাদের প্রতিজনকে ডাকবার স্বাধীনতাটুকু গ্রহণ করছি—আমার বিশ্বাস এই ব্যক্তিগত আবেদন আমার আমন্ত্রণের মর্ম আরো সুষ্ঠুভাবেই ফুটিয়ে তুলবে।

## আর্নেস্ট হেমিংওয়ে

আর্নেস্ট হেমিংওয়ে তোমাকে জানাচ্ছি আমার আবেদন। তোমার প্রতিভার কতখানি মূল্য আমি দিয়ে থাকি তুমি তো তা জানো। এ সম্বন্ধে আমি লিখেও জানিয়েছি, তোমার সব বই-ই রুশ ভাষায় অনূদিত হয়েছে, সোভিয়েট পাঠকের কাছে তারা সুপরিচিতও বটে। আমি প্রশংসা করি, এমন একজন লেখক হিসাবেই শুধু আজ তোমাকে আবেদন জানাচ্ছি না। তোমার সঙ্গে অবরুদ্ধ মাদ্রিদে আমার দেখা। সেদিন দুষ্কৃতকারীর দল শাস্তির ভয় না করে বোমা ফেলে হত্যা করেছিল স্পেনের শিশুদের। মুষ্টিমেয় ক'জন মানুষ শান্তিপূর্ণ স্পেনের জনগণের জন্য কি অবর্ণনীয় দুঃখ নিয়ে এল—সে কথা ভেবে তখন তুমি রুষ্ট হয়ে উঠেছিলে। আর সে রোষ সেদিন ছিল ন্যায়সঙ্গত।

আর একটা কথা আমার মনে আছে। যখন ইতালির ফ্যাসিস্টরা ইথিওপিয়া আক্রমণ করে, তখন রোষপূর্ণ এক প্রবন্ধ তুমি লিখেছিলে। তুমি ইতালির মানুষদের ভালবাসতে, আবার একথাও জানতে যে, ইতালির শাসকরা ইথিওপিয়া আক্রমণ করে এক ভয়ানক অন্যায় করেছে। এও তোমার জানা



ছিল যে, আদ্দিস আবাবার পরেই আসবে মাদ্রিদ—তারপর পারী আর লণ্ডন।

অনেক কিছু আজ আমাদের পৃথক করে দিয়েছে, কিন্তু সে তর্ক ত তুলতে চাই না। আমি সেই লেখক আর্নেস্ট হেমিংওয়েকে আবেদন জানাচ্ছি—যিনি স্পেনের বিয়োগান্ত অধ্যায়ে সেখানে ছিলেন। আজ যখন বর্বর মানুষ, শান্তিপূর্ণ শহর, নারী, শিশু আর বৃদ্ধের উপর আণবিক আর অতি-বোমা নিক্ষেপ করবার ইচ্ছা ঢেকে রাখতে চাইছে না—তখন কি তুমি নীরব হয়ে থাকতে পার?

আণবিক অস্ত্র বিনা শর্তে এবং সম্পূর্ণভাবে বে-আইনি বলে ঘোষণার ব্যাপারে তোমার স্বাক্ষর না হলে তো চলবে না।

## রোজের মার্তাঁ দুগার

রোজের মার্তাঁ দুগার তোমার উদ্দেশ্যেই জানাচ্ছি। তোমার সেই আশ্চর্য চিঠিখানি বহুদিন আমি রেখেছিলাম। সেই চিঠিতে তুমি শত্রুর নিন্দা করেছিলে আর আমার শান্তিপ্রিয় জনগণের সম্বন্ধে ভালো কথাই লিখেছিলে। পারীতে যখন ফ্যাসিস্ট আক্রমণকারীরা ঢুকলো—সে চিঠি আমাকে পুড়িয়ে ফেলতে হ'ল।

তুমি বোধ হয় জান যে তোমার এপিক 'থিবোলট পরিবার' আমাদের পাঠকদের কাছে সুপরিচিত। তোমার প্রতি গ্রন্থে মানবতা, সাধারণ মানুষের প্রতি ভালবাসা বিশিষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে—তাই তোমার কাছে আবেদন করা আজ আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছে। তোমাকে স্মরণ করিয়ে দেবার এইটুকু স্বাধীনতা নেব যে আমাদের উভয়ের বন্ধু জাঁ পরিশার ব্লকে প্রায়ই 'প্রতিভার দায়িত্বের কথা বলতেন। মানুষকে আজ যে ভীতি ত্রাসিত করে তুলেছে, সে সম্বন্ধে এখন পর্যন্ত ত তুমি কিছু বলনি। আমার ত মনে হয়, আণবিক অস্ত্র বে-আইনির দাবিতে তোমার যোগ দেওয়া উচিত। কোন দল থেকে এ দাবি আসে নি, সমস্ত মানুষের এ দাবি।

## জে, বি, প্রিস্টলি

জে, বি, প্রিস্টলি—এবার তোমার উদ্দেশ্যে জানাচ্ছি। আমরা পরস্পরকে চিনি না। আমার যুদ্ধকালীন প্রবন্ধের ইংরেজি অনুবাদের সঙ্গে তুমি অনুগ্রহ করে একটি ভূমিকা জুড়ে দিয়েছিলে। সেখানে তুমি যে লেখক যুদ্ধ-পাপীদের [illegible] তাঁকেই বেশী মূল্য দিয়েছিলে। প্রিস্টলি, লেখকদের

যুদ্ধ-পাপীদের বিরুদ্ধে তারা দুষ্কার্য করার আগেই রুখে দাঁড়ানো উচিত—তাতে পাপ দূর করবার চেষ্টা হবে—তোমার কি তা মনে হয় না ?

কয়েক বছর আগে তুমি যখন মস্কো ভ্রমণে এসেছিলে, তুমি সম্ভবত বুঝতে পেরেছিলে যে আমাদের পাঠকদের কাছে তুমি সুপরিচিত, যখন শান্তি সম্মেলনের পরে পারী থেকে ফিরে গেলাম—আমাকে ওরা তুমি যোগ দিয়েছিলে কিনা সে কথা জিজ্ঞেস করল। তোমার অনুপস্থিতির কারণ কি করে তাদের বোঝাব ভেবে পেলাম না।

পারীতে আমি শুনেছিলাম তুমি ক্লান্ত, আর অমন সম্মেলনের সাফল্যে তোমার আস্থা নেই বলেই তুমি যোগ দিতে রাজী হওনি। জে, বি, প্রিসৃটলি—আমিও ক্লান্ত, অনেক কিছুর জন্যই ক্লান্ত। তোমার ভূমিকায় শোভিত গ্রন্থে যার কথা বলেছি, আর ননজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য আজ যার তোড়জোড় শুরু হয়েছে—সেই যুদ্ধের জন্যই আমি ক্লান্ত।

সম্মেলনে আর সভা-সমিতিতে বক্তৃতা দেওয়ার চাইতে উপন্যাস বা নাটক লেখা ভালো—এবিষয়ে তোমার সঙ্গে আমি একমত, কিন্তু আমার পাঠকদের কাছে দায়িত্ব তো এড়াতে পারি না। তাই যদিও আমি ক্লান্ত তোমার কাছে জানাচ্ছি আবেদন। একথা সত্য যে, আমি তোমাকে চুক্তিনামা দিতে পারি না যে আমাদের এই আবেদন দুষ্কৃতকারীদের থামিয়ে দেবে, কিন্তু একথা নিশ্চিত বলতে পারি যে তুমি যদি আণবিক অস্ত্রের বিরুদ্ধে না দাঁড়াও, যদি আমাদের আবেদনে স্বাক্ষর না কর, তাহলে মস্কো, লণ্ডন, এমন কি তোমার নিউ ইয়র্কের পাঠকও তোমাকে ক্ষমা করবে না।

## আর্সকাইল কল্ডওয়েল

আর্সকাইল কল্ডওয়েল, তোমার কাছে আবেদন জানাচ্ছি। যখন নাৎসীরা আমাদের আক্রমণ করে তখন তুমি ছিলে সোভিয়েট ইউনিয়নে। হয়ত তোমার মনে আছে, কেমন করে আমরা একই বিমান-হানা রোধকারী আশ্রয়ে ঠাঁই নিয়েছিলাম। দুষ্কৃতকারীরা তখন মস্কোর উপর বোমা ফেলছিল। তুমি চমৎকার বলছিলে, ঠাট্টা করছিলে, অজান্তে কেটে গিয়েছিল—গ্রীষ্মের সেই রাত। শুধু ঠাট্টাই তুমি কর নি, তুমি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিলে। সেই কথা স্মরণ করে, আবেদন জানাচ্ছি। তোমাকে এই আবেদনে স্বাক্ষর দিতে হবে।

তুমি আমেরিকার সাধারণ মানুষের দুঃখ নিয়ে সুন্দর লিখেছ। এই সব



চাইতে ভয়ংকর বিপর্যয় থেকে এই মানুষদের রক্ষা করবার জন্য এগিয়ে আসবে না—তাত হতে পারে না।

আজ পৃথিবীতে যে সব ঘটনা ঘটছে সে সম্বন্ধে আমার মত তুমি গ্রহণ করবে —সে দাবি আমি একটুও করি না। আমি ছেলেমানুষ নই, আমি বুঝি যে খোলা চিঠি বা ব্যক্তিগত চিঠি একজন লেখকের মতামত পরিবর্তন করতে পারে না। শুধু জীবনই পারে তার মত বদলাতে। কিন্তু আমি তো অন্য জিনিস চাই। যারা শান্তিপূর্ণ শহরগুলি ধ্বংস করবার ষড়যন্ত্র করছে তাদের তুমি নিন্দা কর।

যখন সে ফ্যাসিষ্টদের বিরুদ্ধে নিজেকে রক্ষা করেছিল, যদি তুমি অনুগ্রহ করে মস্কোর সেই স্মৃতি জিইয়ে রেখে থাক, তাহলে মস্কোর কথাও উল্লেখ করো। কিন্তু সে ত কোন রকমেই বাধ্যতামূলক নয়। তোমার পক্ষে বাধ্যতামূলক হচ্ছে আমেরিকার শহরগুলির আর আমেরিকার শিশুদের ভাগ্য নিয়ে ভাবনা। আমার মতে আমাদের এই আবেদনে তোমার স্বাক্ষর করা উচিত।

## আন্দ্রে চামসঁ

আন্দ্রে চামসঁ, তোমার কাছে জানাচ্ছি আমার আবেদন। পুরনো বন্ধুত্বের সূত্রে আমরা আবদ্ধ। তুমি সেই অবরুদ্ধ রক্তশিক্ত মাদ্রিদে ছিলে। তুমি নিজে অতি শান্তিপ্রিয় মানুষ। যুদ্ধকে তুমি ঘৃণা কর, কিন্তু যখন দুষ্কৃতকারীরা তোমার জন্মভূমি দখল করলে তুমি প্রতিরোধ সংগ্রামে যোগ দিলে, যুদ্ধ করলে। আমাদের আবেদনে যুক্ত রয়েছে নানা মতবাদী ফরাসী লেখকদের স্বাক্ষর।

মার্তা স্ফিয়ের স্বাক্ষর রয়েছে আরাগঁর পরে। তুমি কি এই আবেদনে স্বাক্ষর না করে পার ?

আমাদের পাঠকরা তোমার প্রিয় পার্বত্য প্রদেশ সেভানের চাষীদের জীবনী সম্বলিত উপন্যাসের কথা জানে। 'The Well of Miracles' (আশ্চর্যের কূপে) ফ্রান্স ফ্যাসিষ্টদের হাতে কি দুর্দশা ভোগ করেছে, তাই-ই দেখানো হয়েছে। আমার এ বিশ্বাস আছে যে কয়েকজন কুটনীতিজ্ঞ আর রাজনীতি বিশারদের ...ইতে তোমার নায়কদের ভাগ্য তোমার কাছে অনেক প্রিয়।

তুমি শিল্পকে ভালোবাস, অতীতের বিশিষ্ট কীর্তিগুলিকে বাঁচাবার জন্য তুমি যথেষ্ট করেছ। বেশি দিনের কথা নয়, পৃথিবীর অন্য অংশের একখানা দৈনিক সংবাদপত্রে এক প্রবন্ধ ছাপা হয়েছিল ;—যদি এক অতি বোমা এসে পড়ে

তাহলে পারীর কি থাকবে? এই প্রবন্ধ থেকে এটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে, পারীর কিছুই থাকবে না, লুভর আর নোতরদাম—দুই-ই ধ্বংস হয়ে যাবে; ধ্বংস হয়ে যাবে বিবলিওথিকা ন্যাশনাল আর পেতিত পালেই যাদুঘর—তুমি ত আবার তারই একজন পরিচালক।

যারা বোমা আর অতি-বোমার প্রশংসা করছে তাদের বিরুদ্ধে তুমি দাঁড়াবেই —এই আমার বিশ্বাস। তুমি শান্তি রক্ষা করতে চাইবে, রক্ষা করতে চাইবে পারীর পুরনো পাথর আর অভানের শিশুদের। তুমি অবশ্যই এই আবেদনে স্বাক্ষর করবে।

## জন ষ্টাইনবেক

জন ষ্টাইনবেক, আমি তোমাকে নিজে আবেদন জানাচ্ছি। তুমি আমাকে বলেছিলে যুদ্ধের কুয়াশা ছিঁড়ে খুঁড়ে দিতে হবে। তুমি হালে আমাদের দেশে এসেছিলে, আর সেই ভ্রমণ নিয়ে একখানা বইও লিখেছ। এই বইখানিতে তুমি বলেছ যে, যারা যুদ্ধের কুয়াশা তৈরী করছে এমন মার্কিনদের নিয়ে লেখা সোভিয়েট নাটক তোমার পছন্দ নয়। সে তোমার ব্যাপার তুমি জানো।

আমি এই উত্তর দিতে পারি, সোভিয়েট ইউনিয়ন পরিদর্শন সম্বন্ধে তোমার বইখানি আমার ভাল লাগে নি। আমার কাছে গভীরতাহীন এবং চপল মনের পরিচায়ক বলেই মনে হয়েছে। আমার কাছে আমি 'অফ মাইস এ্যাণ্ড মেন' আর 'গ্রেপস্ অফ রাথ'-এর লেখকের কাছ থেকে অন্য কিছুর আশা করেছিলাম। আমার মতে এই দুখানি বইয়ে গভীরতা আর তাৎপর্য দুইই আছে। কিন্তু আমি ত বই বা নাটকের সমালোচনা করতে বসিনি।

তুমি দেখেছিলে (লিখেওছিলে) যে, সোভিয়েটের মানুষ, যুদ্ধ চায় না। আমার মনে হয়, আমেরিকার মানুষরাও তা চায় না। শুধু এই জন্যেই, তুমি আণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধ করে দেবার জন্য এই আবেদনে স্বাক্ষর করবে।

## আলবার্তো মোরাভিয়া

আলবার্তো মোরাভিয়া—তোমার কাছে আমি আবেদন জানাচ্ছি। 'The Indifferent' বা 'উদাসীন' নামে তুমি একখানা চমৎকার বই লিখেছিলে। তোমার অন্যান্য বইয়ের মতো এখানেও তুমি দেখিয়েছিলে, ইতালীর সাধারণ মানুষের ভাগ্য সম্বন্ধে তুমিত মোটেই উদাসীন নও। রোমে তোমার সঙ্গে



বহু বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি, কিন্তু যুদ্ধকে যে সরিয়ে দেওয়া দরকার, এ বিষয়ে আমরা একমত ছিলাম।

যদি তোমার কি মত তা আমি জেনে থাকি, তোমাকেও বুঝে থাকি—তাহলে নিশ্চয় আণবিক অস্ত্রের নিষেধাত্মক এই আবেদনে তুমি স্বাক্ষর করবে।

আমি ক'জনেরই মাত্র নাম করেছি, কিন্তু বহুর কাছে আমার এ আবেদন। যাঁ পাশ্চাত্যের লেখক যাদের সততা আছে,মতবাদ যাই হোক না কেন, তাদের সবার কাছে আমি এ আবেদন জানাচ্ছি। সমগ্র মানুষের জাতিগুলির আর সংস্কৃতির এই বিপদের মুহূর্তে তোমরা ত আর চুপ করে থাকতে পারবে না। আমাদের আবেদনে স্বাক্ষর করেছেন রাজমিস্ত্রী, ইস্পাত গালান যাঁরা তাঁরা, তাঁতী, আঙুর যারা ফলান, চাষী আর শিক্ষকরা, ইঞ্জিনিয়ার আর কৃষিবিদের দল। মুহূর্ত যেন বয়ে না যায়—লেখক এগিয়ে যাবেন সবার আগে। যাদের 'মানবতার বিবেক' বলা হয়, সেই জনগণের স্বর আরও জোরালো আরও স্পষ্ট করেই শোনাতে হবে।

তোমাদের অনেকের লেখাই হয়ত আমি পছন্দ করি না, তোমরাও সোভিয়েট লেখকদের বই সমালোচনা করতে পার, বাতিল করে দিতে পার, কিন্তু তবু তোমাদেরও ত শান্তি চাই। সবারই চাই শান্তি, শিল্পের জন্য চাই শান্তি। পাশ্চাত্যের সেরা লেখকদের মানবতার উপর আমার বিশ্বাস অক্ষুন্ন রাখতে চাই। বহু পাঠকদের আছে সে বিশ্বাস, তাই তা মিথ্যে করে দিও না। তোমরা নিয়ে এসে দাঁড়াও সহজ, শান্ত, কঠোর ভাষা: আণবিক অস্ত্রের নিষিদ্ধতা দাবি কর, যারা লাখো লাখো নিরীহ মানুষের হত্যার উপায় নিরূপণ করছে, তাদের জানাও সতর্ক বাণী: দাবি কর সবগুলি মহাদেশের সবগুলি নগরের, সবগুলি শিশুর শান্তি।

অনুবাদ: অশোক গুহ

# নীল বিদ্রোহ

সুকুমার মিত্র

নীল বিদ্রোহের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস আজ পর্যন্ত লেখা হয় নি, হয়ত ভবিষ্যতে লেখা হবে। মধ্য, পূর্ব, উত্তর বঙ্গের বিশাল এলাকা জুড়ে একদিন ৫০ লক্ষ চাষীর প্রচণ্ড বিক্ষোভ বিদ্রোহের আকারে দেখা দিয়েছিল। ইতিহাসে এর স্থান নগণ্য নয়, গণসংগ্রামের ইতিহাসে ত নয়ই।

১৮০০ খৃঃ অঃ থেকেই নীলের চাষ বেশ জেঁকে ওঠে। লুব্ধ শ্বেতাঙ্গ বণিকের দল মোটা মুনাফার গন্ধ পেয়ে দলে দলে এই বাংলা দেশে হাজির হয়। বাংলা দেশের বড় বড় জমিদার বাবুরাও নীলের ব্যবসায় নেমে পড়েন। ১৮১১ খৃঃ অব্দের মধ্যে যশোর, নদীয়া, পাবনা ও ঢাকা জেলা নীলকুঠিতে ছেয়ে যায়। লক্ষ লক্ষ চাষীর রক্ত শোষণ করে শ্বেতাঙ্গ বণিক ও জমিদারদের দল মুনাফার পাহাড় গড়ে তোলে—তাদের ঘরে ঘরে ঐশ্বর্য ও বিলাসের স্রোত বইতে থাকে। নীলকরদের অতুলনীয় সমৃদ্ধি এবং নবাবীয়ানা সেদিন প্রবাদবাক্যের মত ছড়িয়ে পড়ে, চাষীরা তা নিয়ে গান বাঁধে।

নীলকরদের প্রাসাদোপম কুঠিগুলিতে বাবুর্চিখানা, আস্তাবল, পক্ষীশালা, ফলের বাগান ইত্যাদি কিছুরই অভাব ছিল না। নিশ্চিন্তপুরের কুঠিতে ৭০টি ঘোড়ার আস্তাবল ছিল। বড় বড় জমিদাররা শ্বেতাঙ্গ ম্যানেজার রেখে নীল ব্যবসা চালাতেন। এই সব ম্যানেজার রাজার হালে থাকতেন। লেখকের মাতামহ কিছুকাল নড়াইল (যশোর) এষ্টেটের ম্যানেজার ছিলেন। তাঁকে ঘোড়াখালির নীলকুঠিতে থাকতে দেওয়া হয়েছিল। মাতামহীর কাছে এই পুরাতন কুঠির যে বর্ণনা লেখক শুনেছেন তাতে শ্বেতাঙ্গ ম্যানেজারদের বিলাসিতার কাহিনী বর্ণে বর্ণে সত্য প্রমাণিত হয়। ঘোড়াখালির কুঠি এখনও আছে। নীলকর সাহেবেরা অনেক গ্রামের রাস্তা পাকা করে নিয়ে জুড়ী বা চার ঘোড়ার গাড়ী চালাতেন। নীলকরদের এই ঐশ্বর্য-বিলাস নিয়ে চাষীরা গান বাঁধে—

"বজরা চলে এলো মেলো ডিঙ্গা চলে সাথে,
দেবী ( Davies ) সাহেবের নীল ঘোড়া চলে ভাঙ্গা পথে।"



## (২)

ইংরেজ বণিকদের হাতে রাজদণ্ড যাবার পর থেকেই প্রাচীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর প্রচণ্ড আঘাত পড়তে থাকে এবং সে আঘাতে কৃষক ও গ্রাম্য কারিগরদের জীবনযাত্রা একেবারে বিপর্যস্ত হয়ে যায়। পুরাতন আর্থনীতিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে গেল, কিন্তু নতুন কিছু গড়ে উঠল না, বরং পুরাতন শোষণ ব্যবস্থার সঙ্গে নতুন শোষণ ব্যবস্থা শুরু হয়ে জনসাধারণের জীবনকে অসহনীয় করে তুলল। দেখা দিল ছিয়াত্তরের মন্বন্তর। বিক্ষুব্ধ ও সর্বহারা কৃষকরা বিদ্রোহ করল। এই বিদ্রোহই সন্ন্যাসী বিদ্রোহ নামে খ্যাতি লাভ করেছে। সন্ন্যাসী বিদ্রোহ দমন করার পরই ব্রিটিশ শাসকরা একটি শক্তিশালী তাঁবেদার শ্রেণী সৃষ্টি করে তাঁদের নয়া ব্যবস্থা চালু করার কাজে লেগে গেলেন এবং এই উদ্দেশ্যে ১৭৯৩ খৃঃ অব্দে "চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত" আইন করে জমির উপর চাষীদের সমস্ত অধিকার কেড়ে নিয়ে জমিদারদের সর্বময় প্রভু করে দেওয়া হল। চাষীরা নয়া ব্যবস্থা মেনে নিতে বাধ্য হল, কিন্তু তাদের বিক্ষোভের আগুন নিভ্‌ল না। বাংলা দেশের পরবর্তী ইতিহাস ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কৃষকদের বার বার বিদ্রোহেরই ইতিহাস।

কৃষকদের ছোটখাট বিক্ষোভ চল্‌তে থাকে এবং ১৮৫৫ খৃঃ অব্দে বিদ্রোহের আকার লাভ করে। সাঁওতাল বিদ্রোহ নামে এই বিদ্রোহ ইতিহাসে স্থান লাভ করেছে। এর স্বল্পকাল পরেই জাতীয় অভ্যুত্থানের আকারে ১৮৫৭ খৃঃ অব্দে "সিপাই বিদ্রোহ" শুরু হয়।

মূল কথা হচ্ছে এই যে, ভারতের জনসাধারণ ব্রিটিশ বণিক শ্রেণীর নয়া শাসনব্যবস্থাকে মান্‌তে চায় নি এবং ১৭৫৭ খৃঃ অব্দে পলাসীর রণক্ষেত্রে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের যে ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার উৎখাতের জন্য একশত বছরের মধ্যেই বার বার তারা বিদ্রোহ করেছে। ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে বিদ্রোহ বার বার ব্যর্থ হয়েছে, কিন্তু প্রত্যক্ষ সংগ্রামের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে জনসাধারণ এগিয়েই চলেছে, পিছিয়ে যায় নি। ফিউডাল বা সামন্ত প্রথার বিরুদ্ধে ভারতীয় জনগণের সংগ্রাম বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন আকারে পরিচালিত হয়েছে এবং ব্রিটিশ শাসকশক্তি যে এই সামন্ততন্ত্রের পোষক এ কথাও ভারতীয় জনগণ কম-বেশী পরিমাণে অনেক আগে থেকেই বুঝেছে। সিপাই বিদ্রোহে এই চেতনা রীতিমত পরিস্ফুটি লাভ করে।

সিপাই বিদ্রোহের পর বাংলা দেশে নীল বিদ্রোহের আকারে নির্যাতিত ও শোষিত কৃষকদের ব্যাপক বিক্ষোভ ফেটে পড়ে।

## ( ৩ )

দিগন্তব্যাপী সমতল ভূমি। মাঝে মাঝে গ্রাম, আম কাঁঠাল নারিকেল ও খেজুর গাছের সার। মাঝে মাঝে খাল, বিল ও নদী। মধ্য বঙ্গের দৃশ্য মোটামুটি এই রকমই। মধ্য বাংলার এই শান্ত পরিবেশের মধ্যে মানুষ—কালো কালো শান্ত লোকগুলি একদিন ক্ষেপে উঠ্‌ল। পশুর মত উদয়াস্ত খেটে, পশুর মত নীরবে অত্যাচার সহ্য করে নীলকর ও জমিদারদের মুনাফার পাহাড় যারা গড়ে তুলছিল তারা ক্ষেপে উঠল একদিন। প্রতিরোধের আহ্বান ছড়িয়ে পড়ল আগুনের মত গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। গান বাঁধল চাষীরা :—

"জাতির শত্রু নীল, কাজের শত্রু চিল
জাতির শত্রু পাদ্‌রী ছিল।"

সাম্রাজ্যবাদী শাসক ও শোষক শ্রেণীর এমন সহজ রূপ উদ্‌ঘাটন চাষী কবি ছাড়া কে করতে পারত?

নীলকরদের অত্যাচারে উৎপীড়িত ছোট ছোট জমিদার ও গাঁতিদার শ্রেণীর মধ্যবিত্তরাও চাষীদের সঙ্গে যোগ দিলেন। সিপাই বিদ্রোহের ঐতিহ্য চাষীরা ভুলে যায় নি। তারা তাদের নেতাদের নাম দিয়েছিল "নানা সাহেব", "তান্তিয়া তোপী" ইত্যাদি। হাজার হাজার মানুষ নেমে এল লড়াইয়ের মাঠে। শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য ঢাক বাজিয়ে সংকেত ধ্বনি করা হ'ত। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসত গ্রাম গ্রামান্তর থেকে শত শত লোক লাঠি সড়কী নিয়ে। যশোরের চৌগাছা গ্রামের বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস ও দিগম্বর বিশ্বাস এই দুই ভাই সর্বস্ব ঢেলে দিয়েছিলেন নীল বিদ্রোহের সাফল্যের জন্য। তাঁরা বরিশাল থেকে লাঠিয়াল আনিয়ে চাষীদের লাঠি খেলা শেখান। এমন জঙ্গী মানুষ মধ্যবিত্ত বা সম্পন্ন চাষীদের মধ্য থেকে কিছু কিছু এসেছিলেন সেদিন কিন্তু বিদ্রোহের মূল শক্তি ছিল সাধারণ চাষীরা। জঙ্গী সংগঠন তারাই গড়ে তুলেছিল। শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের মধ্যে যাঁরা কাগজে পত্রে লিখে ও মামলা মোকদ্দমা পরিচালনা করে নীলকর বিরোধী আন্দোলনে সহায়তা করেছিলেন তাঁহাদের মধ্যে হরিশচন্দ্র মুখার্জি, শিশির কুমার ঘোষ, গিরিশ চন্দ্র বসু, দীনবন্ধু মিত্র প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। অবশ্য শিক্ষিত



মধ্যবিত্তদের মধ্যে তখন ইংরেজের ন্যায় বিচারের উপর ভরসা প্রবল ছিল এবং সেই কারণে প্রধানত নিয়মতান্ত্রিক পথেই আন্দোলন তাঁরা চালিয়েছিলেন এবং তাঁদের নিয়মতান্ত্রিক মনোভাবের প্রভাব কৃষকদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু এ কথা অনস্বীকার্য যে চাষীরা নীলকরদের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম চালিয়েছিল তার প্রচণ্ডতা লক্ষ্য করেই ইংরাজ সরকার দ্রুত ব্যবস্থা অবলম্বন করে। চাষীদের বাড়াবাড়ি অর্থাৎ জঙ্গী ভাব অধিকাংশ মধ্যবিত্ত নেতাই ভাল চোখে দেখেন নি।

যে সমস্ত মধ্যবিত্ত জঙ্গী চাষীদের হয়ে লড়েছিলেন তাঁদের প্রভূত দুঃখকষ্ট স্বীকার করতে হয়েছিল। হরিশচন্দ্র মুখার্জি ঋণগ্রস্ত অবস্থায় ক্ষয় রোগে মারা যান, গিরিশ চন্দ্র বসু ছিলেন পুলিস ইনস্পেক্টর। নীলকরদের অত্যাচার সম্পর্কে "হিন্দু পেট্রিয়ট" প্রবন্ধ লিখে শেষ পর্যন্ত তাঁকে ইস্তফা দিতে হয়। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' অনুবাদ করার জন্যে মাইকেল মধুসূধন দত্ত গোপনে তিরস্কৃত ও অপমানিত হন এবং শেষ জীবনে সুপ্রিম কোর্টের চাকরী ত্যাগ করতে পর্যন্ত তিনি বাধ্য হন। মাইকেল মধুসূধনকে বাঁচাতে গিয়ে লং সাহেব একমাস কারাদণ্ড ভোগ করেন এবং তাঁর হাজার টাকা জরিমানা কালীপ্রসন্ন দিয়ে দেন।

এই ব্যাপার নিয়ে চাষীরা গান বাঁধে :—

"নীল বাঁদরে সোনার বাঙালা করলে এবার ছারখার,
অসময়ে হরিশ ম'লো, লং-এর হল কারাগার—
প্রজার আর প্রাণ বাঁচানো ভার।"

হরিশচন্দ্র মুখার্জির প্রতি কৃষকদের ভক্তি ও দরদ তাদের গানেই প্রকাশ পেয়েছে :—

"ভাসছে মন মনের হরিশে।
( আগে ) লুটে খেত এক হরিশে, (নীলকুঠির জনৈক অত্যাচারী কর্মচারী)
( এখন ) বাঁচালে এক হরিশে।
বুনে বুনে নীল কত জমি খীল
( এখন ) হতেছে তায় অঢ়র কলাই সরিষে॥

জঙ্গী চাষীদের লড়াই এমন তীব্র আকার ধারণ করে যে ব্যাপক বিদ্রোহের আশংকায় বৃটিশ শাসকদের হৃৎকম্প শুরু হয়। লর্ড ক্যানিং বলেন, "বর্তমান নীলকর ব্যাপারে প্রায় এক সপ্তাহ ব্যাপী আমার এতই উৎকণ্ঠা হয়েছিল যে বুঝি দিল্লীর ব্যাপারেও (সিপাই বিদ্রোহ—লেঃ) তত হয় নি। আমি ক্রমাগত ভেবেছি কোন নির্বোধ নীলকর যদি ভয়ে বা রাগের মাথায় একটি গুলিও চালায় তা' হলে সেই মুহূর্তেই দক্ষিণ বাংলার সমস্ত কুঠিতেই আগুন জ্বলে উঠবে।" বাংলার তৎকালীন (লেঃ গবর্নর স্যার জে, পি, গ্রাণ্ট তাঁর ১৮৬০ সালের ১৭ই

সেপ্টেম্বরের বিবরণীতে কুমার ও কালী গঙ্গা নদীর দুই তীরে ৬০/৭০ মাইল ব্যাপী গণবিক্ষোভ সম্পর্কে লিখেছেন :—

"..........হাজার হাজার নরনারী ও বালকবালিকার এই বিক্ষোভের কোন অর্থ নেই এ মনে করা বোকামী মাত্র। দেশের এতটা জায়গা জুড়ে এই উল্লেখযোগ্য বিক্ষোভ প্রদর্শন অভীষ্ট লাভের জন্যে মিলিত ও যুগপৎ কাজ করার যে সংগঠন ও শক্তির প্রমাণ দিয়েছে তা বিশেষভাবে বিবেচনা করে দেখার বিষয়।"

বিদ্রোহের অবসান ঘটানর জন্যে নীল কমিশন বসানো হয়। ১৮৬০ সালের ১৪ই মার্চ ৫ জন সদস্য নিয়ে এই কমিশন গঠিত হয়। কমিশনের রিপোর্টের কয়েকটি দফা উল্লেখযোগ্য।

"১৮৫ দফা। এই অফিপ্রায়ে আমরা এত্তেলা সমাপ্ত করিলাম যে সকল প্রস্তাব করিয়াছি তাহা সাক্ষিগণের জবানবন্দী ও দলিল দ্বারা উত্তমরূপে প্রমাণ হইয়াছে। অর্থাৎ—

১ প্রথম। জমিদারদের সহিত নীলকরদের সম্বন্ধ অসন্তোষজনক নহে।

২ দ্বিতীয়। নীলকরদের সহিত প্রজার সম্বন্ধ সন্তোষজনক নহে।

৪ চতুর্থ। নীলকরের বিরুদ্ধে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবানেরা এবং পুলিস আমলারা কোন অন্যায় আচরণ করে নাই।

১৮৬ দফা দ্বিতীয় প্রধান বিষয়ে আমাদের অভিপ্রায় এই যে রাজ্য শাসন ও সভ্যতার বিষয় সংক্রান্ত বিবেচনায় ইংরাজ দিগের মফঃস্বলে থাকিয়া বাণিজ্য ও ব্যবসা করিতে সর্বতোভাবে উৎসাহিত করা আবশ্যক কিন্তু তাহারা যে প্রথায় এখন কর্ম চালাইতেছেন তাহা পরিবর্তন করা উচিত।"

( বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগারে রক্ষিত পুরাতন বাংলা অনুবাদ হইতে। পৃঃ ৭৯ )

## ( ৪ )

নীল কমিশন বসিয়েই বিদ্রোহ দমন করা যায় নি। বিদ্রোহ দমনের জন্য সশস্ত্র সৈন্য বাহিনী নিয়োগ করতে হয়েছিল। যশোর ও নদীয়া জেলায় দুই দল পদাতিক সৈন্য ও দুটি ছোট রণতরী ( গানবোট ) পাঠানো হয়। নীলকরদের সঙ্গে বিদ্রোহী চাষীদের নানা স্থানে প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়। যে মোল্লাহাটি কুঠির অত্যাচারের কাহিনীকে দীনবন্ধু মিত্র তার 'নীলদর্পন' নাটকে রূপ দেন সেই মোল্লাহাটির লড়াই সম্পর্কে চাষীরা গান বাঁধে :—

"মোল্লা হাটির লম্বা লাঠি, রইল সব হদোর আটি,
কলকাতার বাবু ভেয়ে, এল সব বজরা চেপে, লড়াই দেখবে বলে।"

১৮৮৯ খৃঃ অব্দে যশোর জেলার বিজলিয়া কুঠিতে আবার বিদ্রোহ হয়। ৪৮টি গ্রামের লোক দলবদ্ধ হয়ে এই বিদ্রোহ করে। নীলের ব্যবসায়ে তখন ভাঁটা



পড়েছে, কাজেই এই বিদ্রোহ বড় আকার ধারণ করে নি। এ বিদ্রোহে (বিক্ষোভই বলা ভাল ) প্রধানত মধ্যবিত্তরাই নেতৃত্ব করেন। ষষ্ঠীপুরের জমিদার বঙ্কবিহারী ও তাঁর ছোট ভাই বসন্ত কুমার মিত্র এই বিক্ষোভের নেতা ছিলেন। নীল কুঠির ডোম্বোল সাহেবের অত্যাচারের বিরুদ্ধেই এই বিক্ষোভ হয়। এ নিয়ে যাঁরা আন্দোলন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে যদুনাথ মজুমদার ( তখন ল্যাহোর ট্রিবিউনের সম্পাদক ), কেদার নাথ ঘোষ ( কেশবানন্দ ভারতী ), 'কল্যানী' পত্রিকার ( নড়াইল ) সম্পাদক বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, আশুতোষ গাঙ্গুলী ( ঘুল্লিয়া ) ও প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

নীল বিদ্রোহের সময় খুলনা জেলাতেও নীলকর ও শ্বেতাঙ্গ জমিদার রেণী ও মরেল সাহেবের অত্যাচরের বিরুদ্ধে কৃষক মধ্যবিত্ত ও ছোট বাঙ্গালী জমিদাররা মিলিতভাবে সংগ্রাম করেন। শ্রীরামপুরের শিবরাম ঘোষ, বাহিরদিয়ার চন্দ্রকান্ত দত্ত, বিরাট নিবাসী লাঠিয়াল কাদের মোল্লা, পানিহাটির ভৈরবচন্দ্র মিত্র, তিলকের রাম চন্দ্র প্রভৃতি এই লড়াই চালান। এই লড়াইয়ের রাজনৈতিক তাৎপর্য বিশেষ না থাকলেও শ্বেতাঙ্গ নীলকর ও জমিদারদের বিরুদ্ধে তখন যে দেশব্যাপী কৃষক বিক্ষাভ দেখা দিয়েছে এটা যে তারই অংশ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই লড়াই নিয়ে চাষীদের গান বাঁধে :—

"চন্দ্র দত্ত, রণে মত্ত, শিব সেনাপতি
গুলি গোল্যা সাদেক মোল্যা, রেণীর দর্প করল চুর
বাজিল শিবনাথের ডঙ্কা ধন্য বাঙ্গালা বাঙ্গালী বাহাদুর॥"

মরেল সাহেবের জমিদারীতে তার ম্যানেজার হেলী ভীষণ উৎপীড়ন চালাতে থাকে এবং এর ফলে প্রজাদের সঙ্গে হেলীর দলবলের সংঘর্ষ হয়। রহিমউল্লা নামে একজন সম্পন্ন চাষী বিদ্রোহী প্রজাদের নেতা ছিলেন। ১৮৬১ সালের নভেম্বর মাসে হেলি সাহেব বহু লাঠিয়াল নিয়ে রহিম উল্লার বাড়ী ঘেরাও করেন। সুন্দরবনের অনেক বাড়ীর মত রহিমউল্লার বাড়ীর চারপাশে গড় কাটা ছিল। উভয়পক্ষে গুলীবর্ষণ শুরু হয়। রহিমউল্লা ও তাঁর বাড়ীর লোকেরা সদর পথে মোটা মোটা ভিজে কাঁথা টাঙ্গিয়ে বিপক্ষের গুলি রোধের ব্যবস্থা করে সারা রাত্রি নিজেরা গুলি চালায়। রহিমউল্লার গুলি ফুরিয়ে গেলে মেয়েরা রূপোর কাঁকন ভেঙ্গে গুলি তৈরী করে লড়াই চালায়। অবশেষে বীর রহিমউল্লা ঢাল ও রাম দাও হাতে শত্রুপক্ষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং হেলীর গুলিতে নিহত হন। এই লড়াইয়ে ... জন নিহত ও বহু আহত হয় এবং অধিকাংশ হতাহতই হয় হেলীর পক্ষে। যুদ্ধে

জয়লাভ করে হেলী ভয়াবহ অত্যাচার চালায়। এ অত্যাচারের কাহিনী ঐ অঞ্চলের চাষীদের আজও মনে আছে।

নীল বিদ্রোহের পরও বার বার প্রজা বিদ্রোহ হয়েছে বাংলা দেশে। এ সব বিদ্রোহের কাহিনী ছড়িয়ে আছে এখানে ওখানে। নীল বিদ্রোহের পরই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কৃষক বিদ্রোহ হয় পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমায় ইউসুফ শাহী পরগনায় ( ১৮৭২-৭৩ খৃঃ অব্দে )। জমিদারদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে চাষীরা তাদের নেতা ঈশ্বর রায়কে রাজা বলে ঘোষণা করে। অন্যান্য জেলাতেও এই বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। গবর্নমেণ্টের হস্তক্ষেপ ও ১৮৭৩-৭৪ খৃঃ অব্দের দুর্ভিক্ষের ফলে এই বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়। কিন্তু এর ধাক্কাতেই ১৮৮৫ খৃঃ অব্দে প্রজা স্বত্ব আইন তৈরী করতে হয়।



# কুয়াশা

স্কুল হতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর বীরুর খাপছাড়া আব্দার আর অহেতুক কোঁদল প্রায় রুটিনবাঁধা, যেদিন রুটি থাকবে সেদিন ভাত, যেদিন ভাত থাকবে সেদিন মুড়ি আর যেদিন আটা ঘরে নেই সেদিন রুটি চাওয়াতেই বীরুর বীরত্ব। যদিও মাসান্তে একবারও তার আকাঙ্খা পূর্ণ হয় কিনা সন্দেহ তবু তার ঐ এক স্বভাব।

সেদিন তার আব্দারের মাত্রাটি একটু চড়েছিল। মা বারকতক ধমকানির পর নিতান্ত অনুপায় হয়েই মিনুকে ডাকলেন। কারণ, বাড়ীতে যদি বীরুর উপর কা'রো এতটুকু কর্তৃত্ব থাকে ত সে মিনুর। বয়সে অবশ্য মিনু দু'বছরের ছোট, পড়েও এক ক্লাস নিচে, থ্রী তে। কিন্তু বাড়ীর সবাই এমনকি মিনু আর বীরু পর্যন্ত ভাবত যে মিনুই বড়। তাই মিনু তাকে নাম ধরে ডাকত—তার উপর খবরদারি করত। স্কুলের সময় হলে সেই বীরুকে স্নান করাত, জামা প্যাণ্ট পরিয়ে দিত—এমন কি চুল পর্যন্ত আঁচড়িয়ে দিত।

মিনু তখন সবেমাত্র স্কুল হতে ফিরেছে। কয়েক সেকেণ্ডের ভিতর বই-পত্তর রেখে রান্নাঘরে এসে একটি লোভনীয় কথার ভঙ্গীমায় বলল, "তাড়াতাড়ি খেয়ে চল বীরু, আজ একটা ভাল খেলা খেলব'খন।"

মা চলে গেলেই বীরু ঝুড়ি হতে দুটো আলু বের করে মারবল খেলছিল একা একা, মিনুর ভাল খেলার কথা শুনে বিস্ময়ের সুরে বলল, "কি খেলারে মিনু?" বলে আলু দুটো ঝুড়ির মধ্যে রাখল।

মিনু বলল, তাড়াতাড়ি খেয়ে চল, পরে বলব!

বীরু কয়েক সেকেণ্ড আনমনা থেকে বলল, "থাক, খাবনা এখন; চল খেলিগে—" বলতে বলতে সে উঠে পড়ল। মিনু বেঁকে বসল এবার। বলল, "না, খেয়ে চল। নইলে তুমি আবার মাঝখানে খেতে আসবে তখন সব খেলা পণ্ড হয়ে যাবে।" মিনুর যুক্তিটি স্বীকার করে সে বলল, "দে, তাড়াতাড়ি ভাত দে ত [illegible]", খালি মেঝেতেই ঝুপ করে বসে পড়ল।

মিনু তাড়াতাড়ি বীরুর এবং তার নিজের ঢাকা দে'য়া ভাত নিয়ে বসল। বীরু ভাতের থালা সামনে রাখতেই গোগ্রাসে গিলতে শুরু করল।

মিনু আতংকিত হয়ে বলল, "অত তাড়াতাড়ি খাসনে বীরু। পেট কামড়াবে।"

মিনুর কথাকে বীরু একটু সমীহ করেই চলত। কারণ তার মনে মিনুর শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে এতটুকুও সন্দেহের অবকাশ ছিল না। তার কাছে মিনু সর্বজ্ঞ। তার মতে মিনু যা বলে তা' অভ্রান্ত এবং মিনু যা জানে না বোধ হয় পৃথিবীর দু'একজন অনন্যসাধারণ লোক ছাড়া সবারই তা অজ্ঞাত। তাই আস্তে আস্তে চিবোতে চিবোতে অনুনয়ের সুরে বলল, "কি খেলা বলনা মিনু?"

মিনু চোখদুটি বিস্ফারিত করে বলল, "রেশন রেশন খেলা।"

বীরু খেলাটি সম্বন্ধে কিছুই ধারণা করতে না পেরে বিস্মিত হয়ে বলল, "রেশন রেশন আবার কি খেলারে?"

মিনু খাওয়া বন্ধ করে একটু করুণামিশ্রিত অনুযোগের সুরে বলল, "তুই একটা কিছু না। .... বুঝলি না, তুই বেশ রেশনের দোকান করবি। আমি আর বেবী লাইন দিয়ে রেশন আনতে যাব, তুই লিখবি, বলবি আর ওজন করে দিবি, ভাল হবে নারে?"

বীরু খাওয়া স্থগিত রেখে মিনুর কথা শুনছিল। মিনুর কথা শেষ হতেই সে আনন্দের আতিশয্যে উঠে দাঁড়াল, আবার গোগ্রাসে খেতে শুরু করল।

খেতে খেতে বীরু খেলাটি সম্বন্ধে ভাবছিল। হঠাৎ কি একটা কথা মনে হওয়ায় জিজ্ঞেস করল, "মিনু, আমি একা লোক, রেশনের জিনিস লিখব, বলব আবার দেবো কি করে? সত্যিকারের দোকানে ত তিনচার জন লোক থাকে।"

কথাটি মিনুরও মনে হয়নি, সে চিন্তিত হয়ে উপায় খুঁজতে লাগল, বীরুও নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে নেই। এমন একটা ভাল খেলা নষ্ট হতে সে কিছুতেই দেবে না। কিন্তু তার ভরসা ছিল মিনু নিশ্চয় একটা উপায় বার করবেই।

বীরুর ধারণাটা সত্যি। মিনু বলল, "শোন বীরু বেবী প্রথমে আমার সঙ্গে লাইন দেবে! পরে তোর যখন লেখা হবে ও তখন গিয়ে ওজন করে দিয়ে আসবে।" প্রস্তাবটি বীরুর কাছে সমর্থনযোগ্য বলেই বোধ হল।

খাওয়া দাওয়া শেষ করেই বীরু সমস্ত জোগাড় করতে লেগে গেল, মিনু বেবীকে ডাকতে গেল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বীরু প্রস্তুত হল। মিনু বেবীকে নিয়ে এসে লাইন দিল। দু'জনের হাতে দুখানা মোটা কাগজের টুকরো আর দুটি ছেঁড়া ঝুলি।



বীরু গম্ভীর ভাবে বলল, "দাও রেশন কার্ড, কি কি চাই তোমার?" বীরুর গাম্ভীর্য দেখে মিনু আর হাসি চেপে রাখতে পারল না।

মিনুর হাসিতে বীরু অভিমানের সুরে বলল, "তুই সবতাতেই কেবল হাসিস্ মিনু। এ রকম হলে আমি খেলব না।"

মিনুর হাসি বন্ধ হয়ে গেল। উদ্বিগ্ন হয়ে বলল, "আর হাসব না বীরু। যাস্‌নি তুই।"

বীরু খুশী হল। মিনুর হাত হতে কাগজখানা নিয়ে বলল, "কি কি চাই তোমার?"

মিনু বলল, "চাল দিন আর আটা দিন বাবু।" বীরু পূর্বের ন্যায় গম্ভীর ভাবে বলল, "শুধু আটা পাবে না, ময়দাও নিতে হবে। লাট সাহেবের হুকুম।"

শুধু আটা পাবে না শুনে মিনু কিছুক্ষণ চিন্তা করে হেসে বলল, "আটা দিন আর রুটির কুপন দিন।" কুপনের কথায় খুশী হয়ে বীরু বলল, "বেশ, দশ টাকা দাম হয়েছে তোমার।"

খেলা আরম্ভের সময় কুপনের কথা কা'রো মনে না হওয়ায় তার কাগজও জোগাড় হয় নি। কিছুক্ষণ চিন্তা করে শেষে মিনুকে বলল, "আচ্ছা মিনু, কুপন করব কি দিয়ে রে?"

মিনু ছুটে গিয়ে এক টুকরো লাল কাগজ এনে বলল, এতে কুপন ভাল হবে নারে বীরু?

লাল কাগজের টুকরাটির দিকে তাকিয়ে বীরু অত্যন্ত খুশী হল। বলল, "কোথায় পেলিরে এ কাগজ মিনু? সঁত্যিকারের কুপনের মত হবে, নারে?" বলে উজ্জল চোখে কিছুক্ষণ লাল কাগজটির দিকে তাকিয়ে রইল। শেষে তার এক টুকরো মিনুর হাতে দিয়ে বলল, "নাও দশ পাউণ্ডের কুপন দিলাম।" শেষে বেবীকে বলল, তুই এদিক আয়, জিনিসপত্তর ওজন করে দিবি।

বেবী বীরুর নীকট গেলে বীরু চীৎকার করে বলল, "চাল দশ সের, আটা পনের সের।"

মিনু এগিয়ে আসল। ছেঁড়া ঝুলিটা ফাঁক করে বলল, "দে বেবী চাল দে, আটা দে।"

বেবী শুধু হাত দুখানা ঝুলির মধ্যে দিয়ে বললে, "নাও তাল, নাও আতা।" বলে হি হি করে হেসে উঠল। বীরু উৎসাহিত হয়ে বলল, "বেবী ছেলেমানুষ বেশ ভাল করেছে নারে মিনু?"

মিনু মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বেরিয়ে গেল, এবং পরমুহূর্তেই বেবীর পিছনে এসে দাঁড়াল।

এরূপ দুচার বার খেলবার পর বীরু বলল, "আজ আর থাক মিনু। কাল আবার খেলব'খন" বলে তারপর সেদিনকার মত খেলা বন্ধ রাখল।

পরদিন ভোরে বীরু পড়তে বসল। কিন্তু সমস্ত সময় একটি চিন্তা তাকে এমন ভাবে পেয়ে বসল যে তখন তার এক অক্ষরও পড়া হল না। রাত্রে দাদা আর বাবার কথাবার্তা শুনে সে একটি খেলা আবিষ্কার করেছিল কিন্তু তা মিনুকে জানাতে না পারায় তার ক্রমবর্ধমান ব্যাকুলতা কিছুতেই বাঁধ মানছিল না। রাত্রে যখন সে খেলাটি আবিষ্কার করে মিনু তখন ঘুমিয়ে পড়েছে। আজ বীরু ঘুম থেকে উঠবার পূর্বেই মিনু তার ক্লাসের কোনও এক ছাত্রীর বাড়ী অঙ্ক করতে যাওয়াতেই বীরু মুস্কিলে পড়েছে। তাই বারকতক বইপত্তর ওলট পালট করে শেষে হাতের লেখা লিখতে বসল। কিন্তু তাতেও যখন মন বসল না, তখন শ্লেটের উপর ছবি আঁকা শুরু করে দিল।

অনেক চিন্তা ভাবনার পর বীরুর ছবি আঁকা সবেমাত্র আরম্ভ হয়েছে এমন সময় মিনু ছুটে এসে বলল, "চল বীরু, কালকের খেলা খেলিগে। তোর পড়াশুনা হয়নি ?" মিনুকে দেখামাত্র বীরুর ছবি আঁকা বন্ধ হয়ে গেল। বইপত্তর রাখতে রাখতে বলল, "কখন হয়ে গেছে আমার পড়া।" তারপর বলল "কালকের খেলা আর খেলব না মিনু। একটি নতুন খেলা পেয়েছি, বেবীকে ডাক শিগ্ গির।"

মিনুর আবিষ্কৃত রেশন রেশন খেলাটি একদিনেই বাতিল হওয়ায় সে ক্ষুন্ন হয়ে বলল, "কি আবার নতুন খেলা ? রেশন রেশনই ত ভাল ছিল।" মিনুর অনিচ্ছা বুঝতে না পেরে বীরু সোৎসাহে বলতে শুরু করল, "শোন, তুই আর বেবী মিছিল করবি আর আমি পুলিশ হয়ে তোদের গুলি করব। তোরা মরে যাবি।" বীরুর আবিষ্কৃত খেলাটি না শুনতেই মিনুর তাতে অনিচ্ছা ছিল। খেলাটির বিবরণ শুনে অবজ্ঞার সুরে বলল, মেয়েদের উপর গুলি করে শুনেছিস্ কোথাও ?

অবশ্য অন্য কোথাও মিনুর মেয়েপুরুষ বাদ বিচার ছিল না। কিন্তু খেলাটি বানচাল করবার জন্যই এতবড় যুক্তিটা আঁকড়ে ধরল।

মিনু খেলাটি কিছুতেই পছন্দ করছে না দেখে বীরু একটু ঝাঁঝাল সুরে



বলল, জিজ্ঞেস করে দেখিস দাদাকে, কাল বাগবাজার না বৌবাজার কোথায় যেন মেয়েদের উপর গুলি করেছে, চারজন মরেছে।

কথাটা মিনুর তবুও বিশ্বাস হল না। তার এই নয় বছর বয়সেই সে স্ত্রীলোকের অধিক দাবিটুকুর বিষয় সজাগ। কিন্তু দাদা যখন বলেছে তখন আর তাকে অবিশ্বাস করা যায় কি করে ? শেষে বলল, "চল, তাই খেলিগে" বলে কয়েক পা অগ্রসর হয়ে বলল, "তুই সমস্ত জিনিসপত্তর জোগাড় কর। আমি বেবীকে ডেকে নিয়ে আসি—।" বলে মিনু বেবীকে খুঁজতে গেল। বীরু পুলিশী সাজের জন্য আবশ্যকীয় বন্দুক আর পাগড়ীর খোঁজ আরম্ভ করল। ছাতাটার উপর নজর পড়তেই তার মনে হল যে বন্দুকের কাজটা ওতেই ভাল হবে। কিন্তু পাগড়ীর জন্য এতটুকু লাল কাপড় কোথাও না পেয়ে অগত্যা গামছাখানাই মাথায় জড়ালো। জামাটি প্যাণ্টের ভিতর গুজে দিল। আর ছাতাটি কাঁধের উপর বন্দুক রাখবার ঢঙে রেখে দাঁড়িয়ে রইল।

বেবীকে নিয়ে এসে মিনু বীরুর পুলিশী সাজ দেখে হেসে ফেলল। বীরু কাঁধের ছাতাটার দিকে একঝলক দৃষ্টিপাত করে সগর্বে বলল, "ঠিক হয়নি মিনু ? এবার তোরা মিছিল করতে করতে এগিয়ে আয়। মিনু আর বেবী মিছিল শুরু করে দিল। হঠাৎ কি ভেবে মিনু ছুটে এসে বীরুকে বলল, "আচ্ছা বীরু, মিছিলে বলব কি কি ?" বলে নিজেও ভাবতে শুরু করল। হঠাৎ বলল, "শোন বীরু, 'বন্দেমাতরম' আর 'জয় হিন্দ' বলব ?" বীরু বাধা দিয়ে বলল, "ওসব কি আর বলে নাকি আজকাল ? বলবি 'ইনকেলাব জিন্দাবাদ'। আমিও ত কত বলেছি মিছিলে গিয়ে।"

মিনু আঁৎকে উঠল একটু। বলল ভয়ে ভয়ে, "তুইও ঐ মিছিলে যাস্ নাকি বীরু ?"

মিছিলে যাবার কথা বীরু সযত্নে গোপন করে রেখেছিল এতদিন। হঠাৎ ধরা পড়ে ভয়ে ভয়ে বলল, "নারে মিনু, যাইনি আমি মিছিলে। রাস্তা দিয়ে ওরা বলতে বলতে যায় তাই শুনেছি।"

মিনুর ভীতি অন্তর্হিত হল। ভাবল, ও যা ভীতু, ও আবার মিছিলে যাবে ?" পরে বেবীকে বললে, "শোন বেবী, আমি ইনক্লাব বললে তুই জিন্দাবাদ বলবি। আর আমার পিছু পিছু চলবি।" বলে সে আর বেবী চলতে শুরু করে।

দু'তিন পা যেতেই মিনু বলল, "ইনকেলাব"—

বেবী হাসতে হাসতে বলে, "জিন্নাবাদ, জিন্নাবাদ"।

মিন্নু আবার বলে, "ইনকেলাব"।

বেবী আনন্দে হাততালি দিতে দিতে বলে, "জিন্নাবাদ। আবার বল দিদি।"

বীরু ধমক্ দিয়ে উঠল, "বেশী কথা বলিসনে বেবী; মিন্নু যা বলবে তাই বলবি।"

বলে হঠাৎ মুখ দিয়ে 'গুড়ুম' করে একটা আওয়াজ করে। বীরুর শেষের দিকের ব্যাপারটি বুঝতে না পেরে মিন্নু তেমনি চলতে লাগল, বীরু পুনরায় দুবার শব্দ করল, 'গুড়ুম' 'গুড়ুম'।

মিন্নুকে এবারও চলতে দেখে উষ্ণ হয়ে বলল, তুই এখনো চলছিস্ কেনরে মিন্নু? তোদের না গুলি করলাম।" মিন্নু এতক্ষণে মজাটি বুঝতে পারে তাই প্রথমে বেবীকে শুইয়ে রেখে নিজেও শুয়ে পড়ল।

বীরু খুশী হয়ে বলল, "ওঠ মিন্নু, হয়েছে। আবার মিছিল করগে।" কিছুক্ষণ মৌন থেকে মিন্নুকে সতর্ক করে বলল, "এবার কিন্তু গুলি করা মাত্র মরে যাবি।"

এই ধরনের কয়েকবার খেলা চলবার পর মিন্নু বলল, "এবার চান করতে চল বীরু, ইস্কুলের সময় হয়েছে। বিকেলে এসে খেলব'খন।"

স্কুল স্ট্রাইকের জন্য মিন্নু সকাল সকাল বাড়ী ফিরল। কিন্তু বীরু তখনো না আসায় স্কুল না হওয়ার সকল আনন্দ মিন্নুর ম্লান হয়ে গেল। একবার মনে হ'ল বীরুর স্কুল যদি ছুটি না হয়ে থাকে? কথাটা ভাবতেই এক অস্বস্তি অনুভব করল। সমস্ত দুপুরটা কি করে কাটানো যায়? ভাবতে ভাবতে সে গেটের কাছে নেমে গেল।

গেটের কাছে বেশ কিছুক্ষণ বীরুর জন্য প্রতীক্ষা করল। কিন্তু বীরু আসল না দেখে বীরুদের স্কুলের ছেলেদের উপর মিন্নু বিরক্ত হয়ে উঠল। ভাবল সবগুলিই বীরুর মত ভীতু। আমরা মেয়েরা পর্যন্ত স্ট্রাইক করলাম আর ওরা পারল না।

হঠাৎ রাস্তায় প্রবাহমান একটা স্কুল ছেলেদের মিছিল দেখে মিন্নুর বিতৃষ্ণা যেন শতগুণে বেড়ে গেল। ভাবল আজ বীরু আসলে তাকে গোটাকতক শক্ত কথা শুনিয়ে দেবে।

আরো কিছুক্ষন অপেক্ষা করার পরেও বীরু না আসায় মিন্নু ঘরে ফিরে



গেল। এবং অনেকদিন পর পুতুলের বাক্স নিয়ে বসল নিতান্ত অনুপায় হয়েই।

পুতুলের জামা পরাতে পরাতে মিন্নু ভাবল, "সেই কবে বীরুর ছেলের সঙ্গে তার মেয়ের বিয়ে হয়েছে, তারপর আর একটা বিয়েও হয়নি। আজ বীরু আসলে বীরুর মেয়ের সঙ্গে তার ছেলের বিয়ে দেবে।" সে কনেকে সাজপোষাক পরাতে লাগল।

কনের সাজপোষাক একবার পরানো হল কিন্তু তা মনঃপুত না হওয়ায় খুলে ফেলল। আবার পরাল—আবার খুলল। শেষে বিরক্ত হয়ে পুতুলের বাক্স এ কপাশে ঠেলে রেখে সে খালি মেঝেতেই শুয়ে পড়ল।

মিন্নুর যখন ঘুম ভাঙ্গল তখন সন্ধ্যা উৎরে গেছে। কয়েকবার চোখ মুছে চতুর্দিক তাকিয়েও মিন্নু বুঝতে পারল না যে সন্ধ্যা কি সকাল, সমস্ত বাড়ীটা যেন অসম্ভব স্তব্ধ হয়ে আছে। কোথাও এতটুকু সাড়াশব্দ নেই। জানালা দিয়ে রাস্তার পানে তাকাতেই মিন্নু বুঝল যে সন্ধ্যা হয়ে গেছে। হঠাৎ বীরুর কথা মনে পড়তেই সে নিচে ছুটে গেল। কিন্তু অন্ধকার ঘরে মাকে শুয়ে এবং দিদিকে বসে থাকতে দেখে মিন্নু উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। দিদির নিকট বীরুর কথা জিজ্ঞেস করার জন্য গেল কিন্তু মার মুখের দিক তাকাতেই সে ভয় পেল। হঠাৎ যেন গলা ঠেলে কান্না আসতে লাগল তার। কিছুক্ষণ অসাড় হয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে ধীরে ধীরে গেটের কাছে নেমে গেল। রাস্তার অগুন্তি লোকের প্রত্যেককে সে লক্ষ্য করতে লাগল; কিন্তু বীরুর চলার সেই বাঁকা ভংগীটা একবারও চোখে পড়ল না।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে মিন্নু ভয়ে ভয়ে ফুটপাথে নামল। হাটতে হাটতে বীরু রোজ যে স্থানে রাস্তা পার হয়—সেখানে এসে থম্‌কে দাঁড়াল। রাস্তার কালো পিচের উপর কোন রক্তের চিহ্ন না দেখেও সে স্থির হ'তে পারল না। ভাবল পানের দোকানের লোকটির নিকট জিজ্ঞেস করবে, আজ এখানে কোন ছেলে গাড়ী চাপা পড়েছে কিনা। ভাবতে ভাবতে সে দোকানের সম্মুখে এসে দাঁড়াল। কিন্তু কথাটা জিজ্ঞেস করতে তার যেন লজ্জা করতে লাগল। কিছুক্ষণ সেভাবে দাঁড়িয়ে থেকে বাড়ীর দিকে চলল।

হঠাৎ একটা কথা মনে হ'তে মিন্নু দৌড়ে বাড়ী গেল। সে শুনেছে সহরে ... ছেলেধরা এসেছে। কথাটা ভাবতেই মিন্নুর গায়ের রক্ত যেন হিম হয়ে ... সে শুনেছে, ছেলেধরারা নাকি কোন সাধুর শিষ্য। সেখানে পূজা করে

এই সব ছেলেদের বলি..........। ভয়ে মিনু চিৎকার করে উঠল। সে আর ভাবতে পারল না।

কিছুক্ষণ সেখানে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে কি ভেবে মিনু গেটের কাছে গেল। কতক্ষণ রাস্তার লোকের দিকে তাকিয়ে রইল। শেষে শ্রান্ত হয়ে ঘরে এসে মেঝেতে শুয়ে পড়ল।

ভোরে একটা কিসের কোলাহলে মিনু সজাগ হয়ে উঠল। ঘরখানা শূন্য দেখে তার বুকের ভিতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। নিচে একটা চাপা গুঞ্জনের মধ্যে কার কান্না শুনতে পেল।

ভয়ে ভয়ে নিচে নামল মিনু। কিন্তু সেখানেও কাউকে দেখতে না পেয়ে মিনু ভয়ে চিৎকার করতে গেল কিন্তু কোন স্বরই তার কণ্ঠ হতে বেরুল না।

গলাটা শুকিয়ে যেন কাঠ হয়ে গেছে।

কতক্ষণ মিনু সেখানে অসাড় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার পর সে যেন রাস্তায় একটা জনতার আভাষ পেল! বাইরের দিকে পা দিতেই ছেলেধরার কথা মনে হল তার। সমস্ত শরীরটা যেন তার একবার কেঁপে উঠল। শেষে বেপরোয়া হয়েই ছুটে গেটের কাছে গেল।

গেটের নিকট পৌছতেই মিনু বজ্রাহতের মত দাঁড়িয়ে রইল। দেখল ফুটপাথের উপর বীরুর মৃতদেহখানা ফুলে ফুলে ছেয়ে গেছে। মা অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে আছেন। আর চতুর্দিকে অসংখ্য লোকের চাপা উত্তেজনা।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর লোকের কথা শুনে বুঝতে পারল মিনু যে কাল মিছিলের সময় পুলিশের গুলিতে বীরুর মৃত্যু হয়েছে।

হঠাৎ গতকালের খেলাটির কথা মনে পড়ল মিনুর। তখন বীরুর কথাটা মিনু বিশ্বাস করে নি, এমন কি দাদার নজিরের পরেও না। কিন্তু আজ যেন সব কুয়াশা তার দূর হয়ে যাচ্ছে।

—বিমলরঞ্জন দাস বক্সি

## কবিতাগুচ্ছ

### সাগরপারের প্রেতিনী

শব ভাসে রাঙা রক্তে অথৈ কান্না!

নিঝুম আকাশ প্রেতিনীর হাসি
ধূ ধূ নদীচর
কাশবনে কালবৈশাখী এলোমেলো।
কচি কঙ্কালে শিশুর গোঙানি
যাতনায় বুক ফাটা
এপারে ওপারে সতীশব দেহ
কালের চক্রে কাটা।
ঘুঘুচরা ভিটে, খোড়ো চাল ধূ ধূ জ্বলে—
হিঃ হি হেসে ওঠে শঙ্খচূর্ণী
সাত সায়রের পারে!

শ্মশান চুল্লী হে আমার দেশ
আমার জন্ম জন্মের অভিশাপ
হে আমার যুগ যুগ সঞ্চিত পাপ,
তোমার শস্যশ্যামলী অঙ্গে
ক্ষত বিক্ষত জ্বালা
কণ্ঠে হাড়ের মালা—
পদচুম্বিত সমুদ্রে ভাসে
বেওয়ারিশ পচা লাস,
এই ভারতের মহামানবের
কী করুণ ইতিহাস!
হেথায় দাঁড়ায়ে দু'বাহু বাড়ায়ে

মানুষের গলা টিপে
অট্টহাসির হুল্লোড় চলে
সসাগরা শ্বেতদ্বীপে।
দিল্লীতে ঘোরে অশোকের চাকা
করাচীর ধ্বজা চাঁদ-তারা আঁকা
মুক্তির নামে এ কোন অচেনা
নরঘাতী উল্লাস ?
ঝাঁঝা রোদলাগা গুমোট গরম
জ্বলে পুড়ে যায় তারাখসা নীলাকাশ !
ধূলিতে লুটায় আহা কত সাধ
শকুনির ঠোঁটে কত মরা চাঁদ
পথের পাষাণে ঘরছাড়া প্রেম
মাথা খোঁড়ে নির্মম
পদ্মার বুকে ফুলে ফুলে ওঠে কান্না
ঘোলাটে গঙ্গা কান্নায় থম্ থম্ !

বোবা বেদনায় আকুল চাহনি
ফ্যাল ফ্যালে মূক যন্ত্রনা
শব ভাসে রাঙা রক্তে !
কাকে ঠোকরানো চোখের কোটরে
অমাবস্যার কালো
দপ্ দপ্ জ্বলে আলেয়ার আলো
হত্যার পদধ্বনিত রাত্রি জুড়ে।
দীপহীনা শ্যামা পল্লীর বুকে
বেতসের মর্মর
রুক্ষ বাতাসে হে আমার দেশ
স্খলিত আঁচল বিধবার বেশ



চাপা নিঃশ্বাসে ফুলে ফুলে ওঠে
আট কোটি পঞ্জর !

দগ্ধ ললাট পলাশীর মাঠ
কলঙ্ক অবিনাশী
আকাশে বাতাসে খিল খিল খিল
ডাইনীর চাপা হাসি !
অমাবস্যার শ্মশানে গোরোস্থানে
বিবর্ণ চাঁদ পথ আঁকা বাঁকা
ধবধবে শ্বেত ঘোমটায় ঢাকা
সাগরপারের হাসে বিদেশিনী
প্রেতিনী অট্টহাসি।
ভিখারী দেশের স্বাধীনতা শব
ঝোলে ফাঁসিকাঠে স্তব্ধ নীরব
কদর্য দুর্গন্ধ ছড়ায় উৎকট পচাবাসি।
নানা বয়সের শব ভাসে রাঙা রক্তে
অথৈ কান্না সমুদ্র টলমল
হে আমার দেশ দু'চোখে তোমার
ফোঁসে কালাপানি অকুল বিথার
তরল বহ্নি তরঙ্গ নাচে
বিক্ষোভে চঞ্চল !

শুভ্রবসনা প্রেতিনীর শব সাধনায়
বিদেশিনী কাল-ভুজঙ্গিনীর
নৃত্যের মঞ্জীরে
দানো পেয়ে জাগে প্রেত পিশাচেরা
মসজিদে মন্দিরে।

তারি ফাঁকে ফাঁকে বাজের আওয়াজে
চমকায় মহাকাশ
মেঘ চিরে জ্বলে রাঙা বিদ্যুৎ
আগামীর ইতিহাস।
আতঙ্কে ভয়ে ক্রুদ্ধা প্রেতিনী হাসে
শব সাধনার নির্মম ইতিহাসে
সাগরপারের শূকরী অঙ্গে
জ্বলে হীরা মোতি পান্না
গ্রাম জনপদে রক্তের ঢেউ
আকাশ ফাটানো কান্না !

—বিমলচন্দ্র ঘোষ

## সু কা ন্ত

এখানে বস্তির ঘর···
দুরন্ত বৈশাখে···
ঘূর্ণী ঘোরে হু হু করে,
আগুন বাতাসে।
অনেক ঘরের কাজ এই মাত্র সেরে—
মধ্যদিনের রুক্ষদীর্ণ গৈরিক প্রহরে···
সুকান্তর কয়েকটা কবিতা পড়লাম।
কবিতা ! না যেন মধুছন্দা অলকানন্দার গান···
বাঁধনছেড়া পাগলা ঝোরার বান
"অবাক পৃথিবী অবাক···
সেলাম তোমাকে সেলাম,···
এদেশে জন্মে পদাঘাতই শুধু পেলাম···"
তারপর ?
বিদ্রোহ, অভ্যুত্থান !
( যৌবন উপোসী প্রাণ···) অমৃতের বিন্দু বিন্দু···
জীবনের পান পাত্র পূর্ণ করে দিলে।···
অনেক কষ্টে সংগ্রহ করা সুকান্ত'র ক'টি কবিতা···।
অনেক টেনে টুনে একটু সময় করে বসা।
( কোন রকম কাব্যপড়া বা তার আলোচনা—
এ বস্তিতে রীতিমত বাবুয়ানা···
বে-আইনী, ব্যতিক্রম !
বাপ-মা বলেন : "পেটে ভাত জোটে না
তার ঘি খাওয়ার বাহানা !"

কেন জোটে না জিজ্ঞাসা করি ?
মেলে না উত্তর ! জীবন হয়ে ওঠে
অসহ্য…আরো অসহ্য ! অতিমাত্রায় বিরক্তিকর ).
আর, কাব্য সুধাময়, কত মধুময়…
অপরাজিতার গন্ধবহ…কত অনন্ত সঞ্চিত চিরসুন্দর।
প্রিয়তমের নিবিড় আলিঙ্গনের মতো রোমাঞ্চ…
সভ্যতার শ্রেষ্ঠতম অবদান !
অনির্বচনীয় সমারোহে !
( তবু আমাদের ভোগ্য এ নয়…বন্ধু।
আমরা সভ্যতার সেইসব সন্তান…
যাদের এ সমাজ জারজের চোখে দেখে—
আর জন্মপূর্ব থেকে সাক্ষাৎ যমের অকৃপণ দাক্ষিণ্যে
মৃত্যু দেয় দান…
আমাদের সৃষ্টি : সত্যঃ শিবঃ সুন্দরমের বিনিময়ে )
কিন্তু, একটানা পড়ে ফেলেছি।
অতৃপ্ত তৃপ্তির জ্বালায়, অনাস্বাদিত কী এক তন্ময়তায়
সুকান্ত'র সৃজন সত্বার মধ্যে নেমে গেছি।
কী অপূর্ব আনন্দ অফুরান…
প্রাণের প্রাচুর্যে ভরা…
( কুমারী মনটাকে থেকে থেকে পুষ্পিত করে তুলছে
রক্ত-কণায় অতলান্ত সমুদ্র সাত সাপের ফনায় দুলছে। )
রসের অভাবে শুকনো পৃথিবী—
ছন্দে, গানে, জনমন ঐশ্বর্যে শ্যাম-সবুজ…
প্রসারিত সবুজের প্লাবন ;
অমৃতের উৎসের সন্ধান ! এই গান—
ক্রীতদাস মানুষের মুক্তির ইসারা !
এ সেই "জীবনে জীবন যোগ করা"



পরিপূর্ণ গানের পসরা…পরম সত্যের অঙ্গীকার—
সবার উপরে যে সত্য সুন্দরম্
তারই অকুণ্ঠিত নির্মম স্বীকৃতি ঃ
"ছাড়পত্রে" !
নবজাতকের পথ ছেড়ে দিতে হবে…
আদিম-হিংস্র মানবিকতার…
জাগরীতে, তোমাতে আমাতে জনসমুদ্রে জাগ্রত বিপ্লবে—
জবাব মিলবে…জবাব। এটমে নয়, নয়—
হাইড্রোজ্ন বোমায় ! নয় মিছে তপস্যায়—
এ জবাব জনতায় ;
দেশে দেশে জনগনেশের একতায়…
"সূর্য উঠবে কবে ?"
এ শুধু নয় মানবতার সাধকদের কাছে ব্যর্থ আবেদন,
আবেদন নিবেদনের পালা শেষ—
ছত্রে ছত্রে এ নয় আবেগ উন্মত্ত খোকারোগাক্রান্ত
অতি-বিপ্লবী প্রলাপ…কিংবা অলৌকিক ঐশিক আদেশ !
প্রথম কুমারে পাবার প্রত্যাশায়—
এ সেই প্রথম কুমারীর ব্রত উদ্‌যাপনের মতো—
একনিষ্ঠ, বলিষ্ঠ সাথে !
সুমুখে সুদূর ঘোর সংগ্রামী পথ !

*        *        *

সুকান্ত…
তুমি দেখেছ নবজাতকের রুদ্ধগতি…
কাঁটায় ঘেরা বাধার বক্রতায়—
কুঁকড়ে কুঁকড়ে কুকুর জীবনে অকাল মরণ—
তুমি দেখেছ নর-দানবের বড় নিষ্ঠুর পীড়ন…
অবিবেকী অতি নির্যাতন মনুষ্যত্বের।

হীন ছলনায় জানকী-হরণ সাধুবেশী (?) সব
কালাবাজারী দশাননের নিত্য কাজ···
কী আকাশস্পর্শী দম্ভ প্রভুত্বের ?
আকাল এনে স্বজন বেঁচে শয়তান সে নগ্ননিলাজ—
পাহাড় ছাড়ানো মুনাফা লুটেছে···।
মানুষের হাড়ে তুলেছে প্রাসাদ···চমৎকার !
জন জাগরণের সিন্ধুর রোলে তুমি গেছ দিনপঞ্জিকা লিখে ;
"বিদ্রোহ আজ বিদ্রোহ চারিদিকে···"
অচল হিমাচলের (?) বরফ গলান সূর্যের উত্তাপে
কন্যাকুমারীর কালো বিন্দু টলানো গণশক্তির প্রমত্ত প্রতাপে
ছড়ানো বিদ্রোহ !  জেলে, মিছিলে, মহড়ায়, প্রতিরোধে—
যুদ্ধে, শিবিরে, ধর্মঘটে, প্রাকারে, ব্যারিকেডে—
কণ্ঠে-কণ্ঠে পরিখার সংগ্রামে—
অবাধ শত্রু-আক্রমণে বিদ্রোহের গান :
মুক্ত দীপ্ত রক্ত নিশানের কী দুর্জয় প্রগতি-প্রেরণা—
শত্রু তোমার নেইকো পরিত্রাণ···
তৈরী এখানে অযুত পরাণের নির্ভীক বলিদান !

*   *   *

সুকান্ত···
কী মুক্তাস্বচ্ছ তোমার সত্যদৃষ্টি···
ঠিক যেন সূর্য উঠেছে; গাঢ় লাল সূর্য···
কালো রাত্রির শেষে ঝলমলে শুভদিন !
ছোঁ-মারা চিলের উঞ্ছবৃত্তির শেষ পরিণাম—
তুমি স্পষ্ট চিহ্নিত করেছ···।
তুমি দেশে দেশে দেখেছ আগামীর স্রস্টা লেনিনকে
( ছবিতে নয়, মমীতে নয়, প্রতিটি যোদ্ধা মানুষের মাঝে । )
বিরামহীন টাইফুনের মতো ক্ষমাহীন সংগ্রামে ।



তুমি প্রাণের পরতে পরতে, বুকের ভাঁজে ভাঁজে···
রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুভব করেছ, বিপ্লব···সৃষ্টির উৎসব !
তোমার বিপ্লব-স্পন্দিত বুকে···কেবল মাত্র লেনিন স্পন্দিত নয়···
এ দুর্ভাগা দেশে তুমিই সৃষ্টি করেছ, শত শত সত্যভূমিষ্ঠ লেনিন ।
সকল কবির সৃষ্টিকে ছাড়িয়ে গেছে তোমার সমুদ্ধত সৃষ্টি !
সুকান্ত···তুমি স্রষ্টা, তুমি যৌবনের অভিযান—
তুমি সত্যিকার কবি···।
অনুভূতি ভোঁতা ময়ূরপুচ্ছ কবিদের মতো
তুমি কামনা কর নি আকাশ উচ্চ নাম···।
তাঁদের উচ্ছিষ্টের কখনও কর নি প্রত্যাশা—
যারা কেড়েছে মানুষের মতো বাঁচবার অধিকার,
পদদলিত করেছে নরের প্রচণ্ড পৌরুষ···
নারীর দুর্লভ নারীত্ব—লাবণ্যলেহী রূপ···
পণ্যের হাটে ক্লিন্ন করেছে বেচাকেনায়,—
মা-বোন বেচে যারা পয়সা কামায়···
স্ত্রীকে বাধ্য করে পরপুরুষের কামনায়—
যারা অপ্রমত্ত ক্ষমতায়
কিনে নিতে চেয়েছে স্রষ্টার স্বাধিকার—তোমার, আমার !
"আঠার বছর" ভয়ঙ্কর বয়সের কবি তুমি···
তুমি প্রদেশের বন্ধ্যা মাটিতে পলির প্রতিশ্রুতি···
শ্যামল শস্যের বিপুল সম্ভাবনা !
তুমি অবুঝ কুমারী জীবনের আলোকোজ্জ্বল ছবি···
ইন্দ্রধনুর দ্যুতি···তুমি ছায়াঘন স্নিগ্ধ বনস্পতি ।
তুমি রাত্রির গভীর তিমিরে লেলিহ সুপ্রভাত···
তুমি চির-বঞ্চনা সঞ্চিত গণ-বারুদে ঘৃণার স্ফুলিঙ্গ !
তুমি হিংস্র অগ্নিকণা !
আমার মতো কোটি জীবনের মুঠিতে—

অন্ধকার অবরোধ ছিন্ন করবার হাতিয়ার তুলে দিয়েছ।
নিঃশঙ্ক···নিঃস্বার্থ—
তুমি কাজ করে দেখিয়েছ···কাজে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা
তুমি আমার চেতনায় মিলে গেছ!

* * *

তাই, দম-আটকানো বস্তি জীবনে নূতন-হাওয়ার শ্বাস উঠছে···
জীর্ণ দেশের হাড়ে মাসে দুরন্ত আঠারোর ঝড়···
আকাশ পাতাল তোলপাড়···
ঘুম নেই চোখে রাত্রি কাঁপে
শহীদের খুনের স্রোতে বালির বাঁধ ভাঙ্গলো
দিগ্ দিগন্তে লড়াইয়ের হাঁক···
এসেছে ডাক ঃ জনপদে নগরীতে।
দুনিয়ার মেহনত শোষকরা উঠছে টলে···
ভাঙ্গা হাল পানি পায় না, রাষ্ট্রপাল টালমাটাল
বে-সামাল রক্ষিতারা চীৎকার করছে তারস্বরে···সামাল, সামাল
সাথে সাথে কাজ বাড়ছে আমার···সৃষ্টির প্রসার।
আমার গানে তোমার গানের সুর···সুকান্ত···
দুকুল ছাপানো অথৈ···থৈ···টইটম্বুর!
কত জীবন্ত···
তোমার সৃষ্টির রূপান্তর, প্রাণের প্রাচুর্যে ভরপুর···
আমার হৃদয়ে তার উত্তরাধিকার মৃত্যুহীন। আজ
আর্তক্রান্ত মহাকাল···
ধরিত্রীর পাঁজরে পাঁজরে বেদনার কী মহা জিজ্ঞাসা ঃ
যে শিশু ভূমিষ্ঠ হবে···যুগান্তের অন্তিম আঁধারে
সে শিশুর প্রসব কতদূর?
পতনে উত্থানে তারে পথ করে দিতে· কাজ শুধু কাজ
কাজ আর কাজ—অসংখ্য প্রস্তুতি···



বিপ্লবের মহান স্বীকৃতি···আর সবই ভুলে—
আমি গাব অশনির দীর্ণ দগ্ধ গানে···
বলিষ্ঠ বাঁচার মূল্য—তুমি বন্ধু যে ভাবে শেখালে—তার মূল্য ;
—মানুষের মূল্যবোধে, জীর্ণতারে ঝেড়ে, সেই মতো শোধ করে দেবা
মনুষ্যত্বের বাধাশূন্য পদক্ষেপ—
বিদ্রোহে যে ছন্দে জেগে ওঠে—কেশর ফোলা ঝড়ের রাগে
তারই ঝঞ্ঝা মেঘে উত্তুঙ্গ তুফান শিরে তুলে
গর্জনের অমোঘ বজ্র হেনে অজেয় অটল······
এক পাষাণ ভাসানো নামাব ঢল ; ভাসাব শৃঙ্খল!
পৃথিবীর শেষ মুক্তি—স্নানে···প্রেমের পরম অনুরাগে—
তাই, প্রাণ দেওয়া নেওয়ার ইতিহাস লিখে যাই······
মৃত্যুতে নয় ; অমৃতে গড়ি ঠাঁই!

—বন্দনা দাসগুপ্ত

# নূতন চীনের শিক্ষা ও সংস্কৃতি

"রাজনৈতিক অত্যাচারে পিষ্ট এবং অর্থনৈতিক শোষণে ক্লিষ্ট চীনে আমরা কেবল রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এনেই ক্ষান্ত হব না।

"পুরাতন সংস্কৃতির ছত্রছায়ায় যে চীন পশ্চাৎপদ এবং অজ্ঞানাচ্ছন্ন রয়ে গেছে তাকে নতুন সংস্কৃতির প্রভাবে একটি শিক্ষিত এবং অগ্রসর জাতি হিসেবে গড়ে তোলবারও চেষ্টা করব।"

—মাও সে-তুঙ : নূতন গণতন্ত্র।

চীনা বিপ্লবের বিরাট জয়ে যে তাৎপর্য, বিশ্বশান্তির সংগ্রামের পক্ষে তা অত্যন্ত গুরুতর। শুধু তাই নয়, মানবজাতির সংস্কৃতি বিকাশের ইতিহাসে বিজয়ী চীনা বিপ্লব একটা স্মরণীয় ঘটনা। পৃথিবীর সিকিভাগ লোক গভীর অজ্ঞতা এবং পশ্চাৎপদতার হাত থেকে মুক্তি পাবে, তাদের বুদ্ধিবৃত্তি এবং সৃষ্টিক্ষমতা উচ্চস্তরে বিকশিত হবার সুযোগ পাবে, তারা শান্তির মধ্যে পৃথিবীকে নতুন করে গড়বার কাজে যোগ দিতে পারবে—একবার ভেবে দেখুন এসব ঘটনার কি ফলাফল। পৃথিবীর সভ্যতা এবং সাংস্কৃতিক প্রগতির বিকাশে এটা কি একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান নয়? দু'হাজার বছরেরও বেশী পুরনো সামন্তশাসন এবং শতবর্ষব্যাপী সাম্রাজ্যবাদী দাসত্বের ফলে প্রাচীনতম সংস্কৃতি এবং ইতিহাসের উত্তরাধিকারী একটা জাতি সংস্কৃতিগত অজ্ঞতা এবং পশ্চাৎপদতার মধ্যে রয়েছে, তার জনতার বুদ্ধি এবং সৃষ্টিশক্তিকে শ্বাসরুদ্ধ করে মারা হয়েছে, একটা শাণিত সংস্কৃতির ঐতিহ্যের বিকাশ পর্যন্ত অসম্ভব হয়ে পড়েছে। কিন্তু চীনের জনগণ আজ নিজের পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে চীনা জনগণ ছুঁড়ে ফেলেছে তাদের সুদীর্ঘ সাম্রাজ্যবাদী শাসন এবং সামন্তশাহীর বোঝা, দু'হাজার বছরের প্রাচীন, তমসাচ্ছন্ন ইতিহাসে টেনেছে পূর্ণচ্ছেদ। এটি এমনই এক ঐতিহাসিক ঘটনা যার ফলে সমস্ত পৃথিবী টলে উঠেছে।

চীনের জনতা তাদের নিজের দেশ গড়ে নিলো; স্বকীয় গণসংস্কৃতিও তারাই গড়বে। এবং এর পুরোপুরিই সম্ভাবনা রয়েছে। কেননা বিশাল শ্রমিক জনতা যখন শিক্ষা আর সংস্কৃতির কাজে হাত লাগায় তখন তাদের সৃজনি ক্ষমতার আর কোন সীমাই থাকে না। জনগণের এই নতুন শিক্ষা এবং সংস্কৃতি গঠনের কাজ শুধু চীনা জনতারই নয়, একাজ সমস্ত প্রগতিবাদী দুনিয়ার সংস্কৃতিগঠন কর্মের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ।



## *সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদ বিরোধী নূতন গণসংস্কৃতি*

উনিশশো চল্লিশ সালে কমরেড মাও সে-তুঙ তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "নূতন গণতন্ত্র" প্রকাশ করেন। সেই অসামান্য রচনায়, মার্কস-লেনিনবাদী দৃষ্টিকোণের আশ্রয়ে তিনি চীনের আধুনিক সংস্কৃতির ইতিহাসের বিশ্লেষণ দিয়েছেন। তাতে চীনা সংস্কৃতির ভবিষ্যৎ রূপের যে আভাষ তিনি দিয়েছেন তা এই প্রবন্ধে গোড়ায় উদ্ধৃত হয়েছে। তিনি আরও বলেছেন: "চীনের সমগ্র ইতিহাসের বিচারে, (১৯১৯ সালের) ৪ঠা মে আন্দোলনের পরবর্তী কুড়ি বছরে যে প্রগতি এসেছে তা' তার পূর্ববর্তী ৮০ বছরের প্রগতিকেও অতিক্রম করেছে, এমন কি তার পূর্ববর্তী দু'হাজার বছরের প্রগতিকেও ছাড়িয়ে গেছে। আরও বছর কুড়ি সময় পেলে চীনের প্রগতি যে আরও কত দূর এগিয়ে যাবে তা সহজেই অনুমান করা যায়।" অথচ কমরেড মাও সে-তুঙ যে নূতন চীনকে কল্পনানেত্রে দেখেছিলেন মাত্র দশ বছরের মধ্যেই তা বাস্তবে পরিণত হয়েছে। এতে এটাই কি স্পষ্ট হয়ে উঠছে না যে আমাদের জনতার চেষ্টায় ও জগতের প্রগতিশীল জনগণের এবং প্রধানত সমাজবাদী সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্যে, চীন পৃথিবীর অন্যতম সভ্য এবং প্রগতিশীল জাতি বলে গণ্য হয়ে উঠবে?

উপরি-উক্ত গ্রন্থে কমরেড মাও সে-তুঙ, শ্রেণীগত এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্কৃতির দ্বান্দ্বিক সম্পর্কগত দৃষ্টিকোণের আশ্রয়ে চীনের নূতন সংস্কৃতির আন্দোলন, তার মর্মবস্তু (content) এবং তার ভাবী রূপের চারিত্র্য ব্যাখ্যা করেছেন; চীনের সংস্কৃতি সম্বন্ধে বুর্জোয়া ভাববাদী এবং ট্রটস্কিপন্থীর দল যে সব মাথামুণ্ডু ব'কে থাকে, এ গ্রন্থে তিনি তাও খণ্ডন করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে ১৯১৯-এর ৪ঠা মের পর থেকেই চীনের সংস্কৃতি আন্দোলনে নূতন গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য দেখা দিয়েছে। শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বাধীনে এ হ'ল জনগণের সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদ বিরোধী সংস্কৃতির আন্দোলন। এই বৈশিষ্ট্যের ফলেই এ আন্দোলন আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর সমাজবাদী সংস্কৃতির পথে বিকাশ লাভ করছে। মাও সে-তুঙের সংজ্ঞা অনুসারে চীনের নূতন সংস্কৃতির রূপটা জাতীয়, তার মর্মবস্তু হ'ল বিজ্ঞানধর্মী এবং জনপ্রিয়। অর্থাৎ "এ আন্দোলন সাম্রাজ্যবাদী অত্যাচারের বিরোধী, চীনের সম্মান এবং স্বাতন্ত্র্যের পোষক, এবং পারস্পরিক আদানপ্রদান এবং বিকাশ সাধনের সম্পর্কসূত্রে অন্যান্য জাতির সমাজবাদী ও

নূতন গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত, যাতে করে প্রত্যেকটি সংস্কৃতিই নূতন পৃথিবীর সমগ্র সংস্কৃতিরই অংশ হয়ে ওঠে।......এ আন্দোলন সামন্তবাদী চিন্তাধারা এবং কুসংস্কারের বিরোধী ; ন্যায় অন্যায়ের বিচারে এ আন্দোলন কেবল বাস্তব ঘটনারই অনুসন্ধান করে। বাস্তব সত্য ছাড়া অন্য কিছুই এ গ্রাহ্য করে না ; এ আন্দোলন তত্ত্ব এবং ব্যবহারের ঐক্য চায়। চীনের জনতার যাঁরা শতকরা নব্বই ভাগ, সেই শ্রমিক আর চাষীদের স্বার্থের অনুকূলে চলতে পারলেই এ আন্দোলন কালে কালে তাঁদেরই সংস্কৃতি হয়ে দাঁড়াবে।"

উনিশশো উনপঞ্চাশ সালের জনগণের রাজনৈতিক পরামর্শ সভায় গৃহীত সাধারণ কর্মপন্থার মধ্যে মাও সে-তুঙের এই মূল নীতিগুলি স্পষ্টভাবে ধরা রয়েছে ; চীনের শিক্ষা ও সংস্কৃতি গঠনের বাস্তব কর্মপন্থার মধ্যেও তা লিপিবদ্ধ রয়েছে (সাধারণ কর্মপন্থার ৪১-৪৯ অনুচ্ছেদের বক্তব্যের মধ্যে)। ঐ নীতি এবং ঐ কর্মপন্থাই হ'ল নূতন চীনের শিক্ষা ও সংস্কৃতি গঠনের সাধারণ নির্দেশ এবং সাধারণ কর্মপন্থা।

যদিও এখনো চীনা সরকারের অবশিষ্ট শত্রুনিধন এবং তাইওয়ান ও তিব্বতকে মুক্ত করার কাজ বাকি আছে, তবুও আজকে সরকার-প্রতিষ্ঠার পরেই চীনা জনগণের সামনে যে দুটো গুরুতর কাজ রয়েছে তা হ'ল অর্থনৈতিক পুনর্গঠন এবং সংস্কৃতির বিকাশসাধন। গত বছর যখন জনগণের রাজনৈতিক পরামর্শ সভার অধিবেশন চলছিল, কমরেড মাও সে-তুঙ ভবিষ্যদ্বানী করেন যে অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের প্রবল তরঙ্গের পরেই দেখা দেবে একটা প্রবল সাংস্কৃতিক অগ্রগতি। কমরেড মাও সে-তুঙের ভবিষ্যদ্বানী যে ফলবে তাতে কোন সংশয় নেই।

তা হলেও, যদি আমাদের পরিশ্রম সার্থক করতে হয় তা হলে এই সাংস্কৃতিক অগ্রগতির প্রবল উচ্ছ্বাসের জন্য আমাদের তৈরী হ'তে হবে সর্বশক্তি নিয়োগ করে। দীর্ঘকাল সামন্তশাহী এবং বিশেষ করে কুড়ি বছরের কুয়োমিণ্টাঙ্ ফ্যাসিষ্ট অত্যাচারের ফলে মেহনতী জনতা এ পর্যন্ত শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত রয়েছে ; আজ জনগনের এক বিরাট অংশ নিরক্ষর। সংস্কৃতি এবং শিল্পকলা চর্চার সঙ্গে জনগণের কোন সম্পর্ক ছিল না। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গবেষণার কাজকে এমন সাংঘাতিক রকম পিছিয়ে রাখা হয়েছিল যে ক্রমে ক্রমে তা একরকম লোপ পেতে বসেছিল। যা কিছু সামান্য বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি পাওয়া যেতে পারত তাও কুয়োমিণ্টাঙ্ দস্যুরা হয় নষ্ট করেছে, না হয় সরিয়ে ফেলেছে। তারই ফলে, আমাদের নূতন গণতন্ত্রের শিক্ষা এবং সংস্কৃতির ভিত্তি স্থাপনের কাজে এমন



শোচনীয় অবস্থা এবং দুরূহ পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। কেবল জনগণের শক্তির উপর নির্ভর করে আমাদের এগোতে হবে।

এইসব জটিল এবং দুরূহ কর্তব্যের মুখোমুখী অবস্থায় আমাদের দুটি প্রধান লক্ষ্যের অভিমুখে এগোতে হচ্ছে ; প্রথম হ'ল, শিক্ষা ও সংস্কৃতির যে কাজ মুষ্টিমেয় লোকের হাতে ছিল তাকে মেহনতী জনতার ব্যাপক ভিত্তির উপর স্থাপন করতে হবে। দ্বিতীয়ত, শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে লাগাতে হবে দেশের উৎপাদন ব্যবস্থার পুনর্গঠন এবং বিকাশ সাধনের কাজে। অর্থাৎ, শিক্ষা ও সংস্কৃতির জনপ্রিয়তাকে সার্থক ভাবে মিলিয়ে দিতে হবে মানগত উৎকর্ষের সঙ্গে, মিলন ঘটাতে হবে তত্ত্ব এবং ব্যবহারিকতার। কর্তব্য সিদ্ধির জন্য আমাদের বিশিষ্ট অবস্থার মুখাপেক্ষী হতে হচ্ছে, যেমন, শ্রমিক শ্রেণী এবং তার রাজনৈতিক পার্টির নির্ভুল ভাবাদর্শগত নেতৃত্ব ; বিশাল মেহনতী জনতার সমর্থন ; বিভিন্ন স্তরের বিপ্লবী সাংস্কৃতিক কর্মীদের যুক্ত ফ্রণ্টের দৃঢ়বদ্ধতা এবং প্রসার ; আন্তর্জাতিক সমাজবাদী সংস্কৃতির সাহায্য এবং সহযোগিতা। একথা নিশ্চয়ই বলতে হবে যে এর প্রত্যেকটি অবস্থার সুযোগ আমাদের এখনই রয়েছে। আমাদের বিশ্বাস যে কঠিন বাস্তব অবস্থার মধ্যে পড়লেও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কাজ চালিয়ে যাবার ক্ষমতা আমাদের আছে।

নীচের অনুচ্ছেদগুলিতে চীনের শিক্ষা ও সংস্কৃতিগত অবস্থা এবং আমাদের বর্তমান কর্তব্যের একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিতে চাই।

## স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজ

যে সব তথ্য পাওয়া যায় তা থেকে দেখা যাচ্ছে যে আজকাল চীনে প্রাইমারী স্কুল আছে প্রায় ৩০০,০০০, যাদের ছাত্র সংখ্যা ২০,০০০,০০০'র উপর। মিড্‌ল স্কুল আছে প্রায় ৫,০০০, তাদের ছাত্র সংখ্যা ১,৫০০,০০০'রও বেশী ; উচ্চ শিক্ষালয় রয়েছে প্রায় ২০০, যাদের ছাত্র সংখ্যা ১৪০,০০০'কে ছাড়িয়ে গেছে। চীনের ৪৭৫,০০০,০০০ জন-সংখ্যার তুলনায় স্কুল এবং ছাত্র সংখ্যা নিতান্তই কম। কিন্তু গতবছরের ঘটনাবলী থেকে বোঝা যাচ্ছে যে মুক্ত এলাকায়, যেখানে ভূমি-সংস্কার সম্পূর্ণ করা হয়েছে এবং বহুলাংশে শিল্পের পুনর্গঠন হয়েছে, শিক্ষার কাজ খুব দ্রুত এগোচ্ছে।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, উত্তর-পূর্ব চীনে বর্তমানে প্রাইমারী স্কুলের ছাত্র

সংখ্যা ৩,৭৭৭,১৫১ ; যে যায়গা জাপানী অধিকারের সময়ে ছিল ২,৫৪১,৩২২ ; শতকরা ৪৮·২ বৃদ্ধি পেয়েছে। সেখানে ১৯৪১ সালে মিড্‌ল স্কুলের ছাত্র সংখ্যা ছিল জাপানী অধিকারের সময়ে ৬৮,৯০০। এখন বেড়ে হয়েছে ১৪৩,৯৮৬। ১০৮·৬% বৃদ্ধি। হোপেই প্রদেশে বর্তমানে আছে ২,৩৩৭,৪০১ প্রাইমারী ছাত্র ; ১৯৩৬ সালে জাপ-বিরোধী যুদ্ধের এক বছর আগে ছিল ১,২৩৩,৭৮৬ ; ৮৯% বৃদ্ধি। হোপেই, শানটুঙ, শান্‌সি এবং চাহার প্রদেশেমিড্‌ল স্কুলের ছাত্র সংখ্যা সব শুদ্ধ ৩১·৪% বৃদ্ধি পেয়েছে—১৯৩৬ সালের সংখ্যার তুলনায়। মুক্তি যুদ্ধের আগেকার দিনের তুলনায় উত্তর-পূর্ব চীনে স্কুলের সংখ্যা ৬০% বেড়েছে, উত্তর চীনের পাঁচটি প্রদেশে বেড়েছে ৫০%। ছাত্রদের শ্রেণীগত সংস্থানেও প্রচণ্ড পরিবর্তন দেখা যায়। গত বছর, উত্তর-পূর্ব চীনে সমস্ত ছাত্র সংখ্যার ৮১·৩% ভাগই দেখা গেছে শ্রমিক, ক্ষেতমজুর, গরীব কৃষক, মধ্য কৃষক এবং সহরের গরীব ঘরের ছেলেমেয়ে। চীনের ইতিহাসে এমন ঘটনা আগে কখন দেখা যায় নি।

বয়স্ক-শিক্ষার ক্ষেত্র নিরক্ষরতা দূরীকরণও একটা অত্যন্ত জরুরী কাজ। আগেই বলা হয়েছে, নিরক্ষরেরাই জাতির একটা বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ। কাজেই, নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজে অনেক দিন লেগে যাবে। তবুও, অনেক অঞ্চলে এথনই অসাধারণ সাফল্য পাওয়া যাচ্ছে। যেমন, গত বছরেই উত্তর-পূর্ব চীনে, তেইরেন এবং পোর্ট আর্থার অঞ্চলে নিরক্ষরের সংখ্যা জন-সংখ্যার ৩০% ভাগ থেকে মাত্র শতকরা ৪ ভাগে নামিয়ে আনা হয়েছে। এটা অবশ্য একটা ব্যতিক্রম সূচক উদাহরণ।

একথা বিশেষভাবে বলে দেবার দরকার যে তেইরেন এবং পোর্ট আর্থারের নিরক্ষরতা দূরীকরণের সাফল্যে সোভিয়েট শিক্ষা-বিশেষজ্ঞদের সক্রিয় সাহায্য কাজ করেছে। দেশের দূর কোণে কোণে ছড়িয়ে পড়ছে এখন বর্ণপাঠের আন্দোলন। এর প্রধান উপায় হ'ল পড়ার ক্লাস এবং শীতকালে পড়াশোনা। শেষেরটা আর কিছু নয়, শীতকালে কৃষকেরা বেশী সময় দিতে পারেন, তাই তাঁদের সেই সময়ে পড়তে শেখানো হয়। গতবছর শীতকালের পড়ায় দশ লক্ষেরও বেশী কৃষক যোগ দিয়েছিলেন। আমরা চাচ্ছি, এ বছর গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক পাঠশালা এবং পড়তে শেখার ক্লাসের সংখ্যা অনেক বাড়িয়ে ফেলবো ; এবং সংকল্প নিয়েছি ১৯৫১ সালে সারা দেশ জুড়ে ব্যাপক নিরক্ষরতা দূরীকরণের আন্দোলন চালাব, প্রথমত, সেই সব অঞ্চলে যেখানে ভূমি সংস্কারের কাজ সমাধা হয়েছে।



বয়স্কশিক্ষার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ রূপ হ'ল অবসর সময়ের স্কুলশিক্ষা। মুক্তিযুদ্ধের পর অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের অগ্রগতির ফলে কৃষকশ্রেণী থেকে যেসব ক্যাডার আসছেন—প্রাথমিক শিক্ষার জন্য তাঁদের তীব্র আগ্রহ। উৎপাদন ব্যবস্থার পুনর্গঠন এবং বিকাশে চীনা শ্রমিক উচ্চস্তরের উৎসাহ দেখিয়েছেন। উৎপাদন প্রতিযোগিতার আন্দোলনে, আদর্শ শ্রমিককে উৎসাহিত করবার আন্দোলনে এবং কাজের সর্বোচ্চ নূতন মান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে তাঁরা সোৎসাহে যোগ দিয়েছেন। তাঁরা স্বেচ্ছায় কাজের নতুন কায়দাকানুন চালু করছেন, উৎপাদন ক্ষমতাকে উচ্চস্তরে তুলছেন। এ অবস্থার ফলে তাঁদের মনে লেখাপড়া এবং বিজ্ঞান শেখবার একটা তীব্র ইচ্ছা জেগে উঠেছে।

গত বছরে এই উদ্দেশ্যে দেশের সর্বত্র অবসর সময়ের স্কুল গজিয়ে উঠেছে ব্যাঙের ছাতার মতো। উত্তর চীনের পাঁচটি প্রদেশে শ্রমিক-কৃষক ক্যাডারদের তাদের অবসর সময়ে শিক্ষাদানের জন্য প্রায় ৩৪০টি স্কুল বসানো হয়েছে। সমস্ত দেশে শ্রমিকদের জন্য ২,১১০টি অবসর সময়ের স্কুল আছে, তাদের ছাত্রসংখ্যা ৭৫১,১০৯ ( এতে বিশেষ পরিপূরক ( supplementary ) ক্লাসগুলোর কথা ধরা হয় নি )। কিন্তু এই সংখ্যা বাস্তব চাহিদার অনেক পিছনে পড়ে' রয়েছে। এ ধরনের আরো বহু স্কুলের দরকার।

কেবল অবসর সময়ের স্কুলই যথেষ্ট নয়। বহু সুদক্ষ শিল্পশ্রমিক, বহু টেক্‌নিশিয়ান, ইঞ্জিনিয়ার, তত্ত্বাবধায়ক কর্মী, এবং নানাধরনের বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন রয়েছে চীনে। তাঁরা দেশের পক্ষে অত্যাবশ্যক। সুতরাং নিয়মিত সময়ের স্কুল প্রতিষ্ঠা, বহু বৎসরব্যাপী যুদ্ধ এবং ভূমি সংস্কারে যাঁরা পরীক্ষোত্তীর্ণ হয়েছেন সেই সব কৃষক এবং বুদ্ধিজীবী ক্যাডারদের ভিতর থেকে লোক সংগ্রহ করা, জনগণের মুক্তিফৌজের উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও সাধারণ সৈনিকের মধ্য থেকে, শ্রমিকদের মধ্য থেকে লোক বাছাই করে তাদের বিজ্ঞানে সুশিক্ষিত করে তোলা জরুরী কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

## নূতন বুদ্ধিজীবিদের শিক্ষাদান এবং পুরাতন বুদ্ধিজীবিদের পুনঃশিক্ষা

উপরোক্ত পরিস্থিতির কারণে, কেন্দ্রীয় গণসরকার মনে করেন যে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে শ্রমিক কৃষকদের শিক্ষার জন্য এবং শ্রমিক কৃষকদের ভিতর থেকে নতুন বুদ্ধিজীবিশ্রেণীকে শিক্ষিত করে তোলার জন্য শিক্ষাব্যবস্থাকে

উন্নত করাই তাঁদের প্রধান কর্তব্য। এর তাৎপর্য এখানেই যে এর দ্বারা কেবল আজকের মজুর চাষীর সাংস্কৃতিক চাহিদাই মিটবে তা নয়, এর দ্বারা চীনের ভবিষ্যৎ সমাজবাদী পুনর্গঠনের পথও প্রশস্ত হবে।

আমরা আশা করি যে সাত থেকে দশ বছরের মধ্যে চীনদেশে শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীর ভিতর থেকে অযুত অযুত উচ্চ শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী বেরিয়ে আসবেন ; অন্যান্য শ্রেণীর যে সব বুদ্ধিজীবী স্বদেশ, জনগণ, শ্রমিক, কৃষক এবং সৈনিকদের সেবায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ তাঁদেরই পাশে দাঁড়িয়ে তাঁরা চীনের অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং জাতীয় আত্মরক্ষণ ব্যবস্থার পুনর্গঠনে অপরিহার্য ভূমিকা গ্রহণ করবেন। কেন্দ্রীয় গণ-সরকারের শিক্ষা মন্ত্রী ১৯৫০ সালে চীনা জনগণের বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করবার সংকল্প করেছেন, সেখানে শ্রমিক আর কৃষকদের মধ্য থেকেই ছাত্র ভর্তি করা হবে। এই শিক্ষা-কেন্দ্রের শিক্ষা পদ্ধতি এবং পাঠক্রম চলবে নূতন নীতিতে। চীনের পুনর্গঠনের প্রয়োজনের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে সোভিয়েট রুশের অভিজ্ঞতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে তার শিক্ষারীতি। এই কাজে আমাদের সোভিয়েটের বন্ধুরা যে মহৎ সাহায্য দিয়েছেন তার জন্য আমরা বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ।

দ্বিতীয়ত, সরকার আরও একটি সংকল্প গ্রহণ করেছেন। সে সংকল্প অনুসারে ১৯৫০ সাল থেকে সমগ্র দেশের সমস্ত শিক্ষাকেন্দ্র, কারখানা এবং ফৌজী ইউনিট মজুর-চাষীদের জন্য তিন বছর ব্যাপী স্বল্পকালীন মিড্‌ল স্কুল স্থাপনে ব্যাপক সাহায্য দেবে। কৃষক বা শ্রমিক ফ্রন্টের ক্যাডারদের এবং জনগণের মুক্তি ফৌজের অফিসার এবং সৈন্যদেরও এই ধরনের স্বল্পকালীন স্কুলে ভর্তি হয়ে মিড্‌ল স্কুলের মূল পাঠ্যবিষয়গুলি তিন বছরে শেষ করবার সুযোগ দেওয়া হবে। পাশ করবার পর তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা কলেজে পড়াশোনা করতে পারবেন।

শ্রমিক, কৃষক আর সৈনিকের জন্য আমরা স্কুল গৃহের দ্বার উন্মুক্ত করেছি বটে। কিন্তু এছাড়াও, অতীতের যে নীতি জাতীয়-পুনর্গঠনের কর্তব্য থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিল, সে নীতিকে বদলাবার ব্যবস্থা করতেই হবে। যতদিন পর্যন্ত না আমরা বিভিন্ন পুনর্গঠনের জন্য উপযুক্ত কর্মিদল শিক্ষিত করে তুলতে পারছি, "পাশ করা মানেই বেকার হওয়া" এই অবস্থা দূর করার জন্য এবং গণরাষ্ট্রের বিভিন্ন কেন্দ্রকে তাদের প্রয়োজনীয় কর্মীদল বাড়াবার উদ্দেশ্যে ছোট বড়ো পলিটেক্‌নিক্যাল স্কুল স্থাপনে সাহায্য এবং পরামর্শ দেবার জন্য, শিক্ষা বিভাগগুলিকে শিল্প কেন্দ্র, কৃষি কেন্দ্র, যানবাহন, ব্যাঙ্ক এবং শাসন কেন্দ্রগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখতে হবে।



আমাদের আর এক কাজ হবে পুরনো আমলের বুদ্ধিজীবিদের রাজনীতি শিক্ষার সাহায্যে সংস্কার করা। জনগণ কর্তৃক চীনের সাংস্কৃতিক এবং শিক্ষাগত পুনর্গঠনের কাজে সব রকমের বিপ্লবী শ্রেণীর বুদ্ধিজীবিদের মিলিত চেষ্টার প্রয়োজন রয়েছে।

যাতে পুরনো আমলের বুদ্ধিজীবী ও টেক্‌নিশিয়ানরা বিপ্লবের কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারেন সেজন্য তাঁদের যথাযথ শিক্ষা দিতে হবে। চীনা কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে বুদ্ধিজীবিদের প্রতি আমাদের নীতি হ'ল তাঁদের মন জয় করা, ঐক্যবদ্ধ করা, শিক্ষার সাহায্যে তাঁদের সংস্কারসাধন করা। এই উদ্দেশ্যে বুদ্ধিজীবিরা যাতে জীবন সম্বন্ধে বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গী লাভ করেন এবং দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ আয়ত্ব করতে পারেন সেজন্য তাঁদের সাহায্যকল্পে বিভিন্ন স্বল্পকালীন রাজনীতি বিদ্যালয় অথবা পাঠক্রম চালু করবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উনিশশো উনপঞ্চাশ সালে ২০০,০০০'র বেশী লোক এই ধরনের স্কুলে পড়েছেন। পড়ার শেষে তাঁদের উপর বিভিন্ন কাজের ভার দেওয়া হয়েছে।

আমাদের জনগণ আজকাল ব্যাপকভাবে, উৎসাহের সঙ্গে রাজনীতির পড়াশোনা চালাচ্ছেন। সমস্ত মেহনতী ক্যাডার, অধ্যাপক, শিক্ষক, শিল্পী, বৈজ্ঞানিক এবং বিশেষ করে যুবা বুদ্ধিজীবিরা রাজনীতি চর্চাকে তাঁদের দৈনন্দিন জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ বলে মনে করছেন। তাঁদের সাধারণ পাঠ্য পরিধির মধ্যে রয়েছে সমাজবিকাশের ইতিহাস, রাজনৈতিক, অর্থনীতি, মার্কস-এঙ্গেল-লেনিন-ষ্টালিনের প্রধান প্রধান রচনা এবং কমরেড মাও সে-তুঙের রচনাবলী। এরই ফাঁকে তাঁরা সমান উৎসাহে চলতি ঘটনা নিয়ে আলোচনা চালিয়ে থাকেন।

এসব যে বৃথা যায় নি তা বোঝা যায় এর থেকে যে বুদ্ধিজীবিদের মন থেকে মার্কিন মুলুকের মোহ দূর হয়েছে, সোভিয়েট সম্বন্ধে অজ্ঞতার ঘোর কেটে গেছে। অধিকাংশ বুদ্ধিজীবী উপলব্ধি করেছেন শ্রমের মর্যাদা, বুঝেছেন যে মননের শ্রমিক হিসাবে তাঁদেরও মজুর, চাষী আর সৈনিকদের পাশে এসে দাঁড়ানো উচিত। সোভিয়েট রাশিয়ার উচ্চবিকশিত বিজ্ঞান এবং সংস্কৃতি সম্বন্ধে তীব্র ... ফলে চীনা যুবক এবং বুদ্ধিজীবিরা পরম উৎসাহে রুশ ভাষার চর্চা করে নিয়েছেন। সমস্ত বড়ো বড়ো শহরে রুশ ভাষার ক্লাশ আছে। পিকিঙ্‌

এবং মুকদেনে বেতারে রুশ ভাষা শেখানো হয়। এক পিকিঙেই ভাষা পাঠের শ্রোতা আছে ৭০০০-এর উপর।

## জনগণের শিল্প এবং নাটক

বহুকাল ধরেই চীনের বিপ্লবে সাহিত্য এবং শিল্পকর্মের অতি মহৎ ভূমিকা দেখা গিয়েছে। ভাবাদর্শগত শিক্ষা এবং সংগ্রামে শিল্পকে চীনা জনতা খুব বড় হাতিয়ার বলেই মনে করেছেন। নিখিল চীনের সাহিত্য ও শিল্পকর্মীদের প্রথম সভা হয় পিকিঙে, ১৯৪৯ সালে। ছ'শো ষাট জন লেখক, নাট্যকার, সিনেমা কর্মী, শিল্পী, গায়ক এবং নৃত্যশিল্পী এই সভায় যোগ দিয়েছিলেন। নূতন চীন জনগণের সাহিত্য ও শিল্পের কোন ধারা অনুসরন করবে এঁরা তার আলোচনা করেন। সমস্ত দেশের সাহিত্য ও শিল্পক্ষেত্রের ব্যাপক প্রতিনিধিত্ব-মূলক একটি সংগঠনও তাঁরা গড়ে তুললেন। সাহিত্যে ও শিল্পে এই সংগঠনের নেতৃত্বকে প্রভাবশালী করবার জন্য কেন্দ্রীয় গণসরকার একটি সাংস্কৃতিক মন্ত্রিসভাও স্থাপন করেছেন। বিখ্যাত চীনা ঔপন্যাসিক মাও তুন তার নেতা।

উনিশশো বিয়াল্লিশ সালে কমরেড মাও সে-তুঙ ইয়েনানে একটি সাহিত্য ও শিল্পবিষয়ক বিতর্কমণ্ডলীতে এক বক্তৃতা দেন। চীনের সাহিত্যিক ও শিল্পিরা সেই বক্তৃতাটিকে তাঁদের সাহিত্য ও শিল্পনীতির নির্ধারক বলে গ্রহণ করছেন। অর্থাৎ শিল্প-মজুর, চাষী আর সৈনিকদের স্বার্থ সংরক্ষণের নীতিকে মেনে চলবে। জনগণের সঙ্গে শিল্পের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করতে হ'বে; মজুর, চাষী এবং সৈনিকদের মধ্যে জনপ্রিয়তা অর্জনই হবে তার মুখ্য কর্তব্য। শিল্পে জনপ্রিয়তার সঙ্গে উৎকর্ষের সুষ্ঠু মিলন ঘটাতে হবে। অর্থাৎ শিল্পকে জনপ্রিয় করতে হবে কেবল এই শর্তেই যে তাকে উন্নত স্তরে তুলতেই হবে। এবং তার উৎকর্ষ বিধান করতে হবে জনপ্রিয়তার ভিত্তিতেই।

এই নীতির দ্বারা চালিত হয়েই চীনের শিল্পান্দোলন ১৯৪২ সাল থেকে মুক্ত অঞ্চলের মজুর চাষীদের মধ্যে ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে পড়ছে। এর ফলে যে কেবল সাহিত্য ও শিল্পের মর্মবস্তু আরও সমৃদ্ধ এবং প্রাণবন্ত হয়েছে তাই নয়, এর ফলে মেহনতী জনতার মতাদর্শ ও ভাবাবেগের বাহন হয়েছে সাহিত্য ও শিল্প। এই সাহিত্য ও শিল্পের মাধ্যমেই মজুর চাষীকে সঠিকভাবে শিক্ষিত করে তোলা যাবে। এই ধরনের শিল্পান্দোলনের ফলে মজুর ও চাষীদের মধ্য থেকে বহু প্রতিভাবান এবং সৃষ্টিকুশলী কলাকার আবিষ্কৃত হয়েছেন কিংবা তাঁদের পূর্ণ সম্ভাবনার পথ খুঁজে পেয়েছেন। অনেক পরিশ্রম করে তাঁরা চীনের জাতীয় শিল্পের নতুন রূপ



(ধাঁচ) সৃষ্টি করেছেন, কিংবা পুরনো ফর্মকে সংস্কার করে নিয়েছেন। সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং প্রচলিত ফর্ম হ'ল ইয়াঙ্কো নাচ এবং কোমরে বাঁধা ঢোলের নাচ।

ফৌজে সৈনিকেরা বন্দুকের কুঁদোয় স্বরচিত কবিতা বা গান লেখেন। নিজেদের সংগঠিত নাট্য সংঘে তাঁরা নিজেদের জীবন কাহিনী সম্বলিত নাটক অভিনয় করেন। কারখানাতেও নাট্য সংঘ, গানের দল এবং ক্লাব আছে; সেগুলি মজুরেরাই সংগঠিত করেছেন। তাঁরা বহু শিল্পান্দোলন গড়ে তুলেছেন। দেশের প্রধান প্রধান সংবাদপত্রে প্রায়ই মজুরদের লেখা সাহিত্য, প্রবন্ধ এবং নাটক প্রকাশিত হচ্ছে।

গত বছর মে দিবসে পিকিঙের সমস্ত কারখানায় মজুরদের লেখা ৪৮ খানি নাটক একদিনেই অভিনীত হয়েছিল। এই সব কারখানার অভিনয়ে কিংবা রাস্তায় রাস্তায় যে সব দল বেরিয়েছিল সেই সব দলে তিন হাজারেরও বেশী মজুর অভিনয় করেছিলেন। তিয়েন্‌সিনে এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলে এই ধরনের আরো বেশী নাটক অভিনয় হয়েছিল। মজুরদের নৈতিক শক্তির উদ্বোধনে শিল্পান্দোলনের ভূমিকা পরিষ্কার ভাবে প্রমাণিত হয়ে গেছে।

শিল্পগত কাজকর্মের প্রচলিত সাংগঠনিক রূপ হচ্ছে শিল্প কর্মি-মণ্ডলী। এটি একটি মিশ্র সংগঠন; এতে অভিনয়, নাচ, গানবাজনা, শিল্প এবং সাহিত্য সব রকম কাজই চলে। সমস্ত প্রধান শহরে এবং সৈন্যদলে এই রকম শিল্পিমণ্ডলী আছে। এ ছাড়া, ভ্রাম্যমান দলেরা গ্রামাঞ্চলে ঘুরে ঘুরে নাচ, গান, যাত্রা করে বেড়ায়।

জনগণের জীবন্ত সংগ্রামের সঙ্গে আমাদের লেখকদের সৃষ্টিমূলক রচনা ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত। তার ফলে চীনা সাহিত্যে বস্তুতন্ত্রের উজ্জ্বল বিকাশের উপযোগী পরিবেশ তৈরী হয়ে গেছে। বহু বিশিষ্ট লেখক দীর্ঘকাল যাপন করেছেন চাষী আর সৈনিকদের মধ্যে। তাঁরা ভূমি সংস্কার এবং ফৌজের কাজে সরাসরি অংশ গ্রহণ করেছেন। সে জন্য, অধিকাংশ রচনায় ভূমি সংস্কার এবং মুক্তি যুদ্ধের ছাপ পড়েছে।

ভবিষ্যতের সৃষ্টিমূলক রচনার কর্তব্য হবে শিল্পোৎপাদনের পুনর্গঠন এবং উন্নতির সেবায় আত্মনিয়োগ করা। আমরা ১৯৫০ সালে কারখানায়, কৃষি-[illegible] এবং সৈন্যদলে আরও একদল সাহিত্যিককে পাঠাবার সংকল্প নিয়েছি। [illegible] বিদেশী দেশের পাঠকদের কাছে কিছু কিছু শ্রেষ্ঠ চীনা সাহিত্য ইতিমধ্যেই

পরিচিত হয়েছে। এদিকে বিদেশের, বিশেষ করে সোভিয়েট সাহিত্যিকদের বিপ্লবী রচনাও উৎসাহী চীনা পাঠকদের জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। একথা উল্লেখযোগ্য যে মুক্তি যুদ্ধের সময়ে সৈনিকদের সবচেয়ে প্রিয় বই ছিল সিমনভের "দিন রাত্রি", কর্নেইচুকের "ফ্রণ্ট" এবং বেকের "ভয় ও সাহস"। এর কিছু কিছু ফৌজী ক্যাডারদের পাঠ্য তালিকাভুক্ত হয়েছে। এই সব বইয়ের জনপ্রিয় সংস্করণ ছাপা হয়েছিল, এবং এগুলি যুদ্ধবিদ্যার ব্যবহারিক পাঠ্য পুস্তক বলে গণ্য হয়েছে। এইজন্য জনগণের মুক্তি ফৌজের লোকদের কাছে এই সমস্ত বইয়ের লেখক ও নায়কদের নাম খুব জনপ্রিয় এবং সম্মানিত।

গত বছর জনগণের কেন্দ্রীয় সরকার স্থাপনের সময় এ ফাদেয়েভ প্রমুখ সোভিয়েট সংস্কৃতির প্রতিনিধিদল চীনে পদার্পন করেন। মুকদেন, তিয়েনসিন, নানকিং এবং সাংহাইয়ে হাজার হাজার চীনা তাঁদের আন্তরিক স্বাগত সম্ভাষণ জানিয়ে ছিলেন।

ভ্রাতৃপ্রেম এবং আন্তরিক মৈত্রী প্রণোদিত হয়ে তাঁরা চীনের সাংস্কৃতিক, শিল্প এবং বিজ্ঞানের কাজে মূল্যবান সাহায্য এবং প্রেরণা যুগিয়েছেন। এর কিছুকাল পরে কোরীয় জনগণের প্রজাতন্ত্র থেকে এলেন লেখক ও শিল্পীর দল। উনিশশো উনপঞ্চাশ সালে চীন থেকে সংস্কৃতি কর্মীদের সংগঠিত বিভিন্ন দল বিশ্ব শান্তির সৈনিকদের সভায় এবং অক্টোবর সমাজবাদী বিপ্লব দিবসে যোগ দেবার জন্য সোভিয়েট ও পূর্ব ইউরোপ ঘুরে আসেন।

আন্তর্জাতিক সংস্কৃতির প্রসারের পক্ষে সংস্কৃতিকর্মীদলের পরস্পরের দেশে যাতায়াতের একটি গভীর তাৎপর্য আছে। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র এবং পূর্ব-ইউরোপে ঘুরে বেড়িয়ে শিক্ষা করবার মত বিষয়গুলি দেখে আসবার জন্য কেন্দ্রীয় গণসরকার আরও বেশীসংখ্যক বৈজ্ঞানিক, শিল্পী এবং সাংবাদিক পাঠাবার সংকল্প নিয়েছেন। বিভিন্ন দেশের সঙ্গে ছাত্র বিনিময়েরও সংকল্প রয়েছে।

সিনেমার উন্নতিসাধন হ'ল জনগণের শিল্পের জন্য আর একটি বড়ো রকমের কাজ। উনিশশো ছেচল্লিশ সাল থেকেই উত্তরপূর্বাঞ্চলে আমাদের নিজস্ব চলচ্চিত্র প্রচেষ্টা ছিল। দেশের চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে সরকার পরিচালিত ষ্টুডিও উন্নততর আসন লাভ করেছে। কুয়োমিনটাঙের শাসনে দেশে যেসব ছবি দেখানো হ'ত তার বারো আনাই মার্কিনী ছবি যার বেশীরভাগই ছিল খেলো উত্তেজনা এবং ফ্যাসিবাদী ভাবাদর্শের বাহন। সমগ্র দেশের মুক্তির পর ধীরে ধীরে অথচ একাগ্রভাবে এই অবস্থার পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। উনিশশো পঞ্চাশ



সালে সরকারী ষ্টুডিও ৪৪টি ছবি, ৪৮টি সংবাদচিত্র তোলবার এবং চীনা ভাষার শব্দসম্বলিত ৪০টি সোভিয়েট ছবি দেখাবার সংকল্প নিয়েছে।

শ্রমিক, কৃষক এবং সৈনিকদের মধ্যে সিনেমাকে জনপ্রিয় করে তোলবার উদ্দেশ্যে বহুসংখ্যক ফিল্ম-ইউনিট সংগঠন করাও আমাদের একটা প্রধান লক্ষ্য। শ্রমিক, কৃষক এবং সৈনিকদের অল্প অথবা বিনামূল্যে ফিল্ম দেখাবার জন্য কেন্দ্রীয় গণসরকার ১৯৫০ সালে ঐ রকম ৭০০টি ইউনিট সংগঠন করবার সংকল্প নিয়েছেন। সিনেমা শিল্পের গঠনে আমাদের সোভিয়েট বন্ধুরা মালমশলা এবং কায়দা কানুন পরামর্শ দিয়ে যে বিরাট সাহায্য করেছেন তার জন্য তাঁদের প্রতি আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

## *জীবনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত, উন্নত বিজ্ঞানের জন্য*

প্রকৃতি-বিজ্ঞানের গবেষণায় আমাদের দৌর্বল্য সবচেয়ে বেশী। এর কারণ স্পষ্ট; সাম্রাজ্যবাদীরা এবং তাদের ভৃত্যেরা চীনে বিজ্ঞান এবং টেক্‌নিকের উন্নতিতে আগ্রহশীল ছিল না, বরং যথাশক্তি সে উন্নতি ব্যাহত করেছে। চীনে বহু বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আছেন যাঁরা কুয়োমিনটাঙ আমলে গবেষণা চালিয়ে যাবার সুযোগ এবং সরঞ্জাম পান নি। কেন্দ্রীয় গণসরকার এই অবস্থার পরিবর্তন করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। গতবছর চীনের বিজ্ঞান পরিষদ স্থাপিত হয়েছে। তার অধীনে বিভিন্ন গবেষণা কেন্দ্র রয়েছে। বিখ্যাত পণ্ডিত এবং রাষ্ট্রের পরিচালক সভার সহকারী প্রধানমন্ত্রী কুয়ো মো-জো পরিষদের নেতৃত্ব করছেন।

প্রকৃতি বিজ্ঞানের গবেষণার সঙ্গে শিল্প, কৃষি এবং দেশরক্ষা ব্যবস্থার গঠনের সঙ্গতি বজায় রাখার দিকে মূলত লক্ষ্য রেখে চীনের বিজ্ঞান সংগঠন চলছে। নূতন চীনের বিজ্ঞান শান্তি এবং চীনের সমৃদ্ধির সেবায় নিযুক্ত হবে। আমরা মান্ধাতার আমলের মতবাদ এবং পদ্ধতির সংস্কার করবো। বিজ্ঞানকর্মীরা যাতে প্রকৃতি-বিজ্ঞানের গবেষণায় দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের ভাবাদর্শ এবং পদ্ধতি প্রয়োগ করতে পারেন আমরা তাঁদের সেদিকে সাহায্য করবো। তা করতে পারলে বিজ্ঞানীরা বিজ্ঞানের সঙ্গে জনগণের জীবনের অকৃত্রিম এবং নিবিড় সংযোগ স্থাপন করতে পারবেন। সুতরাং অর্থনৈতিক সংগঠনের নানা বিভাগের সঙ্গে বিজ্ঞান পরিষদের বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে মজুর চাষীর ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা গড়ে তোলা

দরকার। মজুর এবং চাষীদের মধ্যে বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করে তোলা দরকার। কেন্দ্রীয় গণসরকার সংস্কৃতি মন্ত্রিসভার অধীনে বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করবার জন্য একটি কার্যালয় স্থাপন করেছেন।

চীনে নূতন প্রকৃতি বিজ্ঞান প্রবর্তন করা সম্বন্ধে বলতে গেলে, যে মিচুরিন সমিতি স্থাপিত হয়েছে তারও বিশেষ করে উল্লেখ করতে হয়। এই সমিতি মিচুরিনের মতবাদ অনুশীলন করে চীনের কৃষিতে প্রয়োগ করবার জন্য তা জনতার মধ্যে প্রচার করেছেন।

চীনের সম্পদ প্রচুর। এই সম্পদকে কাজে লাগাতে হলে উন্নত বিজ্ঞান, কলকৌশল এবং বহু বিজ্ঞান কর্মীর প্রয়োজন। এ অতি কঠিন এবং বিরাট কাজ; এর জন্য সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের এবং জনগণের গণতন্ত্র সমূহের বন্ধুত্বপূর্ণ সাহায্য আমাদের বিশেষ দরকার।

—লু তিঙ-য়ি

# সোভিয়েট ইউনিয়নে ভারতবর্ষ নিয়ে গবেষণা

## সোভিয়েট একাডেমী অব সায়েন্সের ইন্সটিটিউট অব ওরিয়েন্টাল স্টাডিস্-এর দ্বিতীয় অধিবেশন

[ উপরোক্ত অধিবেশনের যে বিবরণী 'সোভিয়েট ল্যাণ্ড' নামক সোভিয়েট পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যায় ১০ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪৯ সালে প্রকাশিত হয়েছে, তার আক্ষরিক অনুবাদ করা হ'ল।—অনুবাদক ]

১৯৪৮ সালের ডিসেম্বর মাসে সোভিয়েট একাডেমী অব সায়েন্সের ইন্সটিটিউট অব ওরিয়েন্টাল ষ্টাডিসের ভারত তথ্য বিশারদদের দ্বিতীয় অধিবেশন বসে। অধিবেশন লেনিনগ্রাডে অনুষ্ঠিত হয় এবং ইহাতে লেনিনগ্রাড, মস্কো এবং তাসখন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০০র বেশী বৈজ্ঞানিক এবং ছাত্র যোগদান করেন।

প্রথম অধিবেশনের পরে যে ১৮ মাস গত হয়েছে আর মধ্যে সোভিয়েটে বৈজ্ঞানিক অনুবাদ বের হয়েছে কার্ল মার্কসের "ভারতের ইতিহাস থেকে ক্রমিক উদ্ধৃতিগুলো" (Chronological Extracts from the History of India) তুলসীদাসের "রামায়ণের" এবং সেই সঙ্গে 'দশম শতাব্দী পর্যন্ত ভারতবর্ষের ইতিহাসের কাঠামো (Outline of the History of India to the 10th Century)। এই সব রচনা সম্পর্কে অধিবেশনে আলোচনা করা হয়।

## ১। *"ভারতবর্ষের ইতিহাস থেকে ক্রমিক উদ্ধৃতিগুলি"*

মস্কো লমনসভ স্টেট ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক আইগর মিখাইলভিচ রেসনার কার্ল মার্কসের "ভারতবর্ষের ইতিহাস থেকে ক্রমিক উদ্ধৃতিগুলো" অনুবাদ প্রকাশ সম্পর্কে একটি সর্বাঙ্গীন এবং অত্যন্ত মনোগ্রাহী রিপোর্ট পেশ করেন।

ভারতবর্ষের ইতিহাস থেকে উদ্ধৃতিগুলো রুশ অনুবাদে এই প্রথম প্রকাশ হল। এগুলোকে কার্ল মার্কস তাঁর জীবনের শেষভাগে সংগ্রহ করেছিলেন। এবং এটা যেন ভারতবর্ষের সমস্যা সম্পর্কে এই মহান চিন্তানায়ক এবং বিপ্লবীর বহু বৎসর ব্যাপী গবেষণার ফলাফলের চুম্বক। কার্ল মার্কস "উদ্ধৃতিগুলো" সংগ্রহ করেছিলেন তাঁর নিজের ব্যবহারের জন্য এবং কাজেকাজেই অত্যন্ত

সংক্ষিপ্ত ষ্টাইলে তিনি এগুলো লিখেছিলেন, এমনকি এগুলো জায়গায় জায়গায় প্রায় সর্টহাণ্ড শেটের মত আকার নিয়েছে। মার্কস প্রায়ই অব্যয় পদ বাদ দিয়েছেন, শব্দগুলোকে সংক্ষেপ করেছেন এবং এমনকি ক্রিয়াপদ ছেড়ে গিয়েছেন, অনেক বাক্য জার্মান কথায় শুরু হয়ে ইংরেজি অথবা ফরাসী কথায় শেষ হয়েছে, অনুচ্ছেদগুলোতে অনেক রুশ, ইতালীয় বা লাটিন শব্দ আছে। যে রিসার্চ কর্মীরা সংস্করণটাকে প্রকাশের জন্য তৈরী করেছেন তাদের কার্ল মার্কসের এই মূল্যবান সম্পত্তিটির অর্থ উদ্ধারের জন্য অনেক পরিশ্রমসাপেক্ষ কাজ করতে হয়েছে।

কার্ল মার্কস তাঁর লেখা এবং বক্তৃতায় ভারতবর্ষ সম্পর্কে যে প্রধান থিসিস প্রতিপন্ন করেছেন অধ্যাপক রিমনার রিপোর্টের ভূমিকা করেন।

এটা বিশেষ করে জানা আছে যে মার্কসের ভারতবর্ষ সম্পর্কে উক্তিগুলো সে যুগের গুরুত্বপূর্ণ প্রাপ্তব্য মালমশলার অত্যন্ত গভীর গবেষণার উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছিল। "উদ্ধৃতিগুলো" থেকে দেখা যায় যে, মার্কস ভারতবর্ষ সম্পর্কে নতুন রচনাগুলো ব্যবহার করেছিলেন, এর মধ্যে তখনকার প্রকাশিত বিখ্যাত রুশিয়ান সমাজতত্ত্ববিদ মাক্সিম কোভালেভিস্কির "সাম্প্রদায়িক জমির মালিকানা" ( Communal land-ownership ) ছিল এবং এটা মার্কস রচনার মূল ভাষায় পাঠ করেছিলেন।

মার্কস শুধু ৬৬৪ সালে আরবদের সিন্ধু বিজয় থেকে শুরু করে ১৮৫৭-৫৯ সালে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে জাতীয় বিদ্রোহ পর্যন্ত ভারতের ইতিহাসের গতির সযত্ন ও বিস্তারিত বিশ্লেষণ দেন নি তিনি সেই সঙ্গে দিয়েছেন তার সংক্ষিপ্ত অথচ শিক্ষণীয় উপসংহার এবং সিদ্ধান্ত, নেতৃত্বসম্পন্ন চরিত্রগুলির বিশ্লেষণ এবং ঘটনার সঠিক পরিমাপ। এই অভিমতগুলির মধ্যেই আছে "উদ্ধৃতিগুলোর" মূল বৈজ্ঞানিক এবং রাজনৈতিক গুরুত্ব। ১৮৫৩ সালেই "ভারতের ব্রিটিশ শাসনের ভবিষ্যৎ" সম্পর্কে তাঁহার বিখ্যাত প্রবন্ধে মার্কস ঘোষণা করেন যে, ভারতের ইতিহাসের সমগ্র ধারা ভারতের জনতার সামনে এনে দিয়েছে একটি প্রধান কাজ, ঔপনিবেশিক শাসনকে—বলপূর্বক খতম করা। এই প্রধান ঐতিহাসিক কাজ, যাহা ভারতের লোকের সামনে চিরকাল ছিল এবং আজও আছে—জাতীয় স্বাধীনতা লাভ করা—তারই নিরিখে মার্কস ব্যক্তি এবং ঘটনাকে যাচাই করেছেন।

মার্কস সব সময়ই অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ভারতের জনগণের



ঐক্যের উপর দারুণ গুরুত্ব আরোপ করেছেন, বিশেষত এই সংগ্রামের ভিত্তিতে হিন্দু মুসলিমের মিলনের উপর। তাই, ১৮৫৭ সালেই তিনি লিখেছিলেন যে, মুসলিম এবং হিন্দুরা তাদের শত্রুতা ভুলে উভয়ের প্রভুর বিরুদ্ধে একত্র হয়েছিল, যে বিক্ষোভ হিন্দুদের মধ্য থেকে শুরু হয় সেটা একজন মুসলমান সম্রাটকে দিল্লীর মসনদে বসিয়ে দেয়।

হিন্দু ও মুসলিমের সহযোগিতা ভারতের সত্যিকার স্বাধীনতা লাভের জন্য চিরকালই এবং আজও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এবং এটা স্বাভাবিক যে মার্কস তাঁর "উদ্ধৃতিগুলো" বিশেষ জোর দিয়েছেন ভারতের ইতিহাসের সেই সব মুহূর্তের উপর যা হিন্দু ও মুসলিমকে পরস্পরের কাছাকাছি এনেছে, যেমনটা ছিল, দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় মোঘল সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে (১৫৫৬-১৬০৫) এই বছরগুলোতে হিন্দুদের মহাকাব্যগুলোকে অনুবাদ করা হয় ফার্সি ভাষায় —সে সময়কার মুসলিম সামন্ততান্ত্রিক কর্তাদের সরকারী ভাষা, মার্কস লক্ষ্য করেছেন (noted) যে, ফৈজী "রামায়ণ" এবং "মহাভারত" অনুবাদ করেছিলেন। আকবরের আমলে যে আইন ছিল সেটা হিন্দু বিধান এবং মুসলিম আইনের এক অদ্ভুত সংমিশ্রন। আকবর শাস্তিদানের বিধান বদলান, কিছুটা ভিত্তি করেন মুসলিম সামাজিক প্রথার উপর এবং কিছুটা মনুর বিধানের উপর।

ভারতের সংস্কৃতি তৈরী হয়েছিল হিন্দু ও মুসলমানের মিলিত চেষ্টার দ্বারা। তারা ব্রিটিশ অত্যাচারীর বিরুদ্ধে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে লড়াই করেছিল সিপাহী বিদ্রোহের মহান বৎসরে এবং আমাদের যুগের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণ-আন্দোলনে।

হিন্দু মুসলিম সংঘর্ষ প্রথমত এবং প্রধানত সাম্রাজ্যবাদী নীতির ফল— "বিভেদনীতি"(devide and rule)—এবং এটা ভারতের ঐতিহাসিক অতীতের ফল নয়। বর্তমান সময়ে যখন সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতবর্ষকে একটা হিন্দু (হিন্দুস্থান) এবং একটা মুসলিম (পাকিস্তান) রাষ্ট্রে ভাগ করে কৃতকার্য হয়েছে, যখন ব্রিটিশ দেশের মধ্যে তার আসন ঠিক রাখার জন্য এই সংঘর্ষকে বাড়িয়ে তুলতে এবং উস্কাতে চেষ্টা করছে তখন হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক সম্বন্ধে মার্কসের উক্তি বিশেষ রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য এবং গুরুত্বের আকার ধারণ করে।

সমগ্র ব্রিটিশ প্রচার যন্ত্র যে হিন্দু-মুসলিমকে প্রাচীন শত্রু এবং তাদের সংস্কৃতিকে গভীর ভাবে পৃথক এমন কি পরস্পর বিপরীত বলে প্রচার করতে চেষ্টা করছে সেটা উদ্দেশ্যহীন ভাবে নয়।

"উদ্ধৃতিগুলো" অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করছে সেই প্রতিরোধের উপর, যা
ভারতবর্ষ দিয়েছে তার শত্রুদের—ব্রিটিশ, "সওদাগর", "ঠকারী", "কুকুর",
"ব্যবসায়ী" বলে মার্কস এদের আখ্যা দিয়েছেন।

ব্রিটিশের পক্ষে ভারতবর্ষ জয় করা একটা দীর্ঘস্থায়ী এবং একটা কঠিন ব্যাপার
হয়ে উঠল, এতে প্রায় ১০০ বৎসর লাগল—১৭৫৭ সাল যখন বাংলা দেশ
বিজিত হয় তখন থেকে ১৮৪৯ সাল যখন পাঞ্জাবকে বলপূর্বক সাম্রাজ্যভুক্ত করা
হয়। মার্কস কি আনন্দেই না ১৭৫৬ সালে বাংলার নবাবের কার্য সম্পর্কে
লিখেছেন, যাতে ব্রিটিশকে আপাতত উৎখাত করা হয় : তিনি লিখেছেন,
১৭৫৬ সালের ২১শে জুন ব্যবসায়ীরা পিট্টান দিল·····বাংলা অনাহত
অতিথিদের থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হল।"

মার্কসের উদ্ধৃতিগুলি ব্রিটিশ বিজেতাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার জন্য
ভারতীয়দের গৌরবময় সংগ্রামের গভীর বাস্তব চিত্র এঁকেছে। ব্রিটিশ
সাম্রাজ্যবাদের স্তাবক, যারা ভারতীয়দেরকে বিদেশীর কাছে এক বাধ্য-নতজানু
দাস জনতা হিসাবে অঙ্কন করে তাদের বিরুদ্ধে এই উদ্ধৃতিগুলো শক্ত আঘাত
হানে।

ভারতীয় দেশপ্রেমিক যারা সাহসের সঙ্গে তাদের মাতৃভূমিকে রক্ষা করেছিল
তাদের সুনামকে পুনরুদ্ধার করার পর মার্কস ক্রোধ এবং ঘৃণার সঙ্গে ভারতীয়
রাজন্যবর্গের বেইমানীকে চাবুক মেরেছেন—যে রাজন্যবর্গ নিজের লোকের গলায়
বিদেশী শাসনের শৃংখল পরাতে ব্রিটিশকে সাহায্য করেছিল, যারা ১৮৫৭—৫৯
সালের জাতীয় বিদ্রোহের সময় প্রভুদের পক্ষ নিয়েছিল। সিন্ধিয়া 'ব্রিটিশ
কুকুর'দের প্রতি বিশ্বস্ত ছিল, কিন্তু তার সিপাহীরা তা ছিল না। আর কি
অপমানের কথা পাতিয়ালার মহারাজা ব্রিটিশের সাহায্যের জন্য 'একটি বৃহৎ
বাহিনী পাঠিয়ে দিয়েছিল'। এর পরের বৎসর ১৮৫৮ সালের ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ
ক'রে তাঁর নোটে মার্কস লিখেছেন, '২রা জুন যুবক সিন্ধিয়া ( ব্রিটিশের বিশ্বস্ত
কুকুর) তার নিজের সৈন্যগণ কর্তৃক ঘোরতর যুদ্ধের পর গোয়ালিয়র থেকে বিতা-
ড়িত হয়েছিল এবং নিজের জান বাঁচাবার জন্য সে পালিয়ে গিয়েছিল আগ্রায়।'

রাজন্যবর্গের বিশ্বাসঘাতকতা, তাদের জাতীয়তাবিরোধী নীতি দৈবাৎ কোন
ঘটনা নয়, কারণ মার্কস ইতিপূর্বে ১৮৫৩ সালেই লিখেছিলেন, "দেশীয় রাজন্যবর্গ
বর্তমান বর্বর ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থার পক্ষে এক অত্যন্ত শক্তিশালী স্তম্ভ এবং
ভারতের প্রগতির পথে এক নিদারুন শক্ত বাধা।"



এর পর ভারতবর্ষে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। ধনতান্ত্রিক সমাজের
শ্রেণী—বুর্জোয়া এবং প্রলেটারিয়েট—ভারতের মাটিতে জন্ম নিয়েছে। গণ-
জাতীয়-মুক্তি আন্দোলন এক প্রচণ্ড শক্তি হয়ে উঠেছে। এবং যদি ভারতবর্ষ
আজ এখনো পূর্ণ মুক্তি এবং স্বাধীনতা না পেয়ে থাকে এবং দেশ হিন্দুস্থান-
পাকিস্তানে বিভক্ত হওয়াতে এর ঐক্য গুরুতর আঘাত লেগে থাকে, তা'হলে
তাতে সাহায্য করেছে ঐ একই গণতান্ত্রিক প্রতিক্রিয়া, বিশেষত রাজন্যবর্গ,
মার্কস যাদের তাঁর "উদ্ধৃতিতে" "ব্রিটিশের বিশ্বস্ত কুকুর" বলে চিহ্নিত
করেছেন।

ব্রিটিশ শাসনে এখনও তাদের "ডিভাইড অ্যাণ্ড রুলের" নীতি অনুসরণ
ক'রে চলেছে, সামন্ততান্ত্রিক প্রতিক্রিয়ার শক্তির দ্বারা তারা সমর্থিত হচ্ছে এবং
ভারতের ধনী বুর্জোয়া যারা নিজের মাতৃভূমির মুক্তির চেয়ে নিজেদের ভাড়াটে
সংকীর্ণ শ্রেণী চেতনাকেই বড় করে দেখে ব্রিটিশ তাদের মেরুদণ্ডহীন কাপুরুষতার
সুযোগ নিচ্ছে।

মার্কস ব্রিটিশ ডিপ্লোম্যাসির দিকে ঘনিষ্ঠ মনযোগ দিয়েছিলেন, ঔপনিবেশিক-
দের সামরিক শ্রেষ্ঠতার সঙ্গে সঙ্গে এই ডিপ্লোম্যাসি তার ভারত জয়ে একটা
ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। তিনি দেখিয়েছেন কেমন করে ব্রিটিশ তাদের
ঐতিহ্যগত বিভেদনীতি ( devide and rule পলিসি ) অনুসরণ করে অষ্টাদশ
শতাব্দীর ভারতবর্ষের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী দুইটি দেশীয় রাষ্ট্রকে পরস্পরের
বিরুদ্ধে লাগিয়েছিল—মহিশূরের মুসলিম রাজ্য এবং মহারাষ্ট্র অধিনায়কদের
হিন্দু রাজ্যসমষ্টি ( Congederation ) এবং তারপর তারা মহিশূর এবং
মহারাষ্ট্রকে একের পর এক পরাজিত করে। এই উদাহরণ এবং অষ্টাদশ ও
উনবিংশ শতাব্দীর ব্রিটিশ ডিপ্লোম্যাসির ক্রিয়াকলাপের আরও উদাহরণ আছে
মার্কস যেগুলোকে নগ্ন করে দেখিয়েছেন সেগুলোর আজকের দিনেও নিদারুণ
রাজনৈতিক মূল্য আছে। কারণ বর্তমানেও ব্রিটিশ ভারতবর্ষে কৃত্রিমভাবে
( artificially ) এক নতুন রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে তুলে—হিন্দুস্থান ও পাকিস্তান—
আশা করছে যে এই দুই রাষ্ট্রকে পরস্পরের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তারা
মহা মীমাংসকের ভূমিকা রক্ষা করতে পারবে এবং এই দুই রাষ্ট্রের প্রকৃত
মালিক থেকে যাবে।

পরিশেষে অধ্যাপক আই, এম, রেসনার বলেন, "খোদ ব্রিটিশ শাসনের
চরিত্র সম্পর্কে মার্কস নিখুঁত অথচ বাগ্মীতা সহকারে বলেছেন যে এটা হল

ধড়িবাজী, জুলুমবাজী এবং অত্যাচারী ব্যবস্থা ( System of roguery coercion and oppression )। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সময় এটা এই রকম ছিল, আমাদের কালেও এটা ঐ রকমই আছে।" ( Such it was in time of the East India Company, such it has remained in our days. )

## ২। তুলসীদাসী রামায়ণের রুশ ভাষায় অনুবাদ

অধিবেশনের দ্বিতীয় বৈঠক তুলসীদাসের রামায়ণের বৈজ্ঞানিক অনুবাদ সম্পর্কে একাডেমিসিয়ান এলোক্স ব্র্যান্নিকভ কর্তৃক আলোচনায় নিবন্ধ থাকে। আলোচনার শুরুতে একাডেমিসিয়ান ব্র্যান্নিকভ উপস্থিত জমায়েতকে বুঝিয়ে দেন কেন তিনি তুলসীদাসের কবিতা অনুবাদের জন্য বেছে নিয়েছেন।

"ইউরোপে আর সেদিন পর্যন্ত আমাদের দেশেও," তিনি বলেন, "এই মত ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল যে আধুনিক ভারতীয় ভাষা কথ্য ভাষা ( dilecis ) যা শুধু কার্যকরী প্রয়োজনের জন্য অনুশীলন করা চলে কিন্তু তত্ত্ববিদদের মনযোগ দাবি করতে পারে না।

"আধুনিক ভারতীয় ভাষা এবং সাহিত্যের প্রতি একই মনোভাব এই প্রতিক্রিয়াশীল এবং মিথ্যা থিসিসগুলো থেকে আসে যাতে বলা হয় বৌদ্ধবাদই ভারতীয় সভ্যতার সবচেয়ে বড় সৃষ্টি, যাতে বলা হয় মুসলমানদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত থাকার কালে ভারত তার সমস্ত সৃজনীশক্তি হারিয়ে ফেলে আর তার সমস্ত জনসংখ্যা নিষ্ক্রিয় জনতায় পরিণত, সৃজনশীল উদ্যোগ থেকে বঞ্চিত, কোন মহৎ শিল্প সৃষ্টির কাজে অপারগ হয়ে পড়ে।

"এই ধরনের তত্ত্ব, যা প্রথমে ম্যাক্সমূলার ব্যক্ত করেন আধুনিক ভারতী ভাষাতত্ত্বের উন্নতির উপর ধ্বংসমূলক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এটা বিশে বৈশিষ্টপূর্ণ যে জার্মানিতে আধুনিক ভারতীয় ভাষাতত্ত্বের উপর একটিও রচনা প্রকাশ করা হয় নি, অথচ সেই সময় সংস্কৃততত্ত্বের বাড়তির জোয়ারের কা আর্যদের সৃষ্টিধর্মী শিল্প বলে প্রাচীন ভাষাতত্ত্বের অনুশীলন এক উচু পর্যায়ে পৌছেছিল।

এমন কি এই ধরনের মতবাদ ভারতের নিজ দেশেও অনুপ্রবেশ করে এ ইউরোপীয় সাহিত্যের বৈজ্ঞানিক অনুশীলন বহুদিন বিলম্বিত হয়ে থাকে। ইউরোপীয়



সঙ্গে মিলে ভারতীয়রাও সংস্কৃত সাহিত্যের সৌন্দর্যে পুলকিত হয়ে উঠেছিলেন আর জাতীয় ভাষা এবং সাহিত্যের প্রতি ঘৃণার্ত মনোভাবকে রপ্ত করেছিলেন। ভারতের বহু পণ্ডিতব্যক্তির মন ব্রিটেনে আবিষ্কৃত—ভারতের মহত্ত্ব তার অতীতে, পুরাকালে নিহিত এই ইতিকথা দিয়ে বিষাক্ত করা হয়েছিল। আধুনিক ভারতীয় ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্রে ভারতীয় পণ্ডিতবর্গের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ রচনা সবে ভারতীয় জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের পরিপুষ্টির পরে আত্মপ্রকাশ করে।

"১৯১১ সালে এল, পি, টেসসিটোরি নামে জনৈক ইতালিয়ান একটা প্রবন্ধ প্রকাশ করেন যাতে তিনি এই অভিমত প্রকাশ করেন যে তুলসীদাসের কবিতা বাল্মিকীর সংস্কৃত কবিতার পুরোপুরি অনুকৃতি মাত্র এবং হিন্দিভাষায় সংস্কৃত রচয়িতার রচনার পদ বিন্যাসের ক্রমের স্বাভাবিক অদলবদল মাত্র। এল, পি, টেসসিটোরি তার গবেষণার ভিত্তি স্থাপন করেন, ম্যাক্সমূলার আর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী বৈজ্ঞানিকদের মিথ্যা থিসিসের উপর।

"জার্মান, ইতালীয় এবং ব্রিটিশ বিজ্ঞানীদের বৈষম্যমূলক ফ্যাসিবাদী থিসিস যার উদাহরণ এমন কি কিছু ভারতীয় পণ্ডিতব্যক্তিও অনুসরণ করেছিলেন," একাডেমিসিয়ান ব্রানানকভ বলেন, প্রকৃতপক্ষে তাকে খতম করার জন্যেই মধ্যযুগের আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যের মহাকাব্য সমূহের শ্রেষ্ঠতম একটি—তুলসীদাসের 'রামায়ণ' অনুবাদের সিদ্ধান্ত করি। এই রচনা মুসলিম শাসনের সন্ধিক্ষণে ভারতীয় জনগণের সৃজনী শক্তিকে প্রদর্শন করায়। এই দেখায় যে আধুনিক ভারতীয় রচয়িতাদের রচনাকে কোনক্রমেই স্থান বা অনুক্রমের পরিবর্তন মাত্র, সংস্কৃত গ্রন্থকারদের রচনার অনুবৃত্তি মাত্র, বলা যায় না এমন কি সেই সমস্ত ক্ষেত্রেও, যেক্ষেত্রে, সেই সুর সংস্কৃত সাহিত্যে ইতিপূর্বে ব্যবহৃত হয়ে থাকলেও।

"গোঁড়া হিন্দুবাদের পদে থেকেও," এ পি ব্রাননিকভ বলেছেন, "তুলসীদাস বর্ণ প্রথাকে তার আদর্শে নির্ভেজাল কাল্পনিক আকারে, রামের উপকথার রাজ্যে যে আকার পরিগ্রহ করেছিল মাত্র তাকেই স্বীকার করেছিলেন। বাস্তবপক্ষে তিনি সত্যিকারের বর্ণপ্রথাকে সাংঘাতিকভাবে আক্রমণ করেছেন। তুলসীদাসের কবিতা আরও বেশী করে ঘা দেয় ব্রাহ্মণদের। তুলসীদাস কর্তৃক রাম উপস্থাপিত হয়েছেন আদর্শ সন্তান, রাজা এবং মানুষ হিসেবে যিনি সারা জীবনব্যাপী বর্ণবিধি লঙ্ঘন করে চলেছেন।"

একাডেমিসিয়ান ব্রাননিকভ আরও বলেন যে একজন পণ্ডিত হিসাবে

তিনি তুলসীদাসের—কবিতার চিন্তা এবং ধারণা, এর প্রতিচ্ছায়া, এর কবিতা, কলাকুশল প্রক্রিয়া যথাসম্ভব নির্ভুলভাবে বজায় রাখবার নীতি অনুসরণ করেছেন এবং কবিতার যোজনার মূলে বিশেষ দিকের আর তার অংশসমূহের কাঠামোকে যত কাছাকাছি উপস্থিত করা সম্ভব তা করেছেন।

পরিশেষে এ, পি ব্রাননিকভ বলেন যে, তিনি একথা প্রমাণিত বলে মনে করেন যে তুলসীদাস তাঁর রামায়ণে কোন পৌরাণিক বীরত্ব আঁকেনও নি, তাঁর সময়কার প্রকৃত ভারতবর্ষকেই এঁকেছিলেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, মধ্যযুগের ভারতবর্ষের ইতিহাস রচয়িতারা যাঁরা প্রধানত মুসলিম গ্রন্থকারদের মালমশলার উপরেই নির্ভর করেন, তাঁদের দেখাতে হবে সাহিত্যকে ইতিহাস রচনার মালমশলা সংগ্রহের উৎস হিসাবে যতটা গণ্য করা যায় সেই পরিমাণে আধুনিক ইতিহাসের মালমশলা সাহিত্য থেকে সংগ্রহের সম্ভাবনা আছে। একাডেমিসিয়ান ব্রাননিকভ এই আশা প্রকাশ করেন যে, তাঁর পরবর্তী রচনায় তুলসীদাসের শিল্প এবং তাঁর যুগ সম্পর্কে লিখতে গিয়ে তিনি ঐ মহান কবির প্রতিভার সমগ্র বৈচিত্র্য দেখাতে পারবেন।

অধিবেশনের তৃতীয় বৈঠকে মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক এ-এম ওসিপভ রচিত টেক্সট্‌বুক "দশম শতাব্দি পর্যন্ত ভারতবর্ষের ইতিহাসের কাঠামো" সম্পর্কে আলোচনা চলে।

এ-এম ওসিপভের বই সম্পর্কে একাডেমিসিয়ান ভি-ভি স্ট্রুভ অত্যন্ত মূল্যবান সমালোচনা করেন। অধ্যাপক ডি-এ সুলেখিনের ছাত্র হিসাবে পোস্ট গ্রাজুয়েট এবং লেনিনগ্রাড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যার্থীরা আরও অনেক মন্তব্য করেন।

অনুবাদ : গোলাম কুদ্দুস

আলোচনার জন্য

# "বাংলা প্রগতি সাহিত্যের আত্ম-সমালোচনা"

'মার্ক্সবাদী'তে রবীন্দ্র গুপ্তের "বাংলা প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা" বের হবার-পর, ঐ লেখার সমর্থনে, ভাষ্য হিসেবে ছ' নম্বর 'মার্কসবাদী'তে আরও দুটো প্রবন্ধ বেরিয়েছিল। তারপর "পৌষের" পরিচয়ে মানিকবাবু "প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা" নিয়ে আলোচনা করেন। অবশ্য, মানিকবাবুর সেই দীর্ঘ আলোচনা থেকে মার্কসবাদীদের বিশেষ কোনই শিক্ষা লাভ হয় নি। তার কারণ এই যে মানিকবাবুর সমস্ত লেখাটাই ছিল একান্তভাবে রাজনীতি-বর্জিত—অত্যন্ত ঢিলেঢালা, শিথিল ধরনের লেখা। রবীন্দ্র গুপ্তের থিসিসের মারাত্মক ত্রুটিগুলো সম্পর্কে মানিকবাবু উদাসীনই থাকেন এবং ঐ থিসিসের পেছনকার 'রাজনীতি'টা আদৌ মার্কসবাদসম্মত কিনা এই অতিপ্রয়োজনীয় প্রশ্নটাও এড়িয়ে যান।

'ফাল্গুনের' পরিচয়ে শ্রীশীতাংশু মৈত্র মানিকবাবুর লেখা নিয়ে আলোচনা-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রগুপ্তের সাহিত্যিক-রাজনৈতিক লাইন আর একবার স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করেন।

রবীন্দ্র গুপ্ত ও তাঁর ভক্তদের দৌলতে মার্কসবাদ যেরকম বিকৃত হয়েছে, মার্কসবাদের নামে তাঁরা কি মারাত্মক ট্রটস্কীবাদী চোরাকারবার করেছেন এতদিন, ঐ সম্পর্কে আজ প্রত্যেক মার্কসবাদীই সচেতন। আজ মার্কসবাদ-বিরোধীদের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো স্পষ্ট করে দেখান দরকার, যাতে করে মার্কসবাদের নামে ভবিষ্যতে আর তাঁরা ভেজাল জিনিস চালু করতে না পারেন। আন্তর্জাতিক মার্কসবাদের শিক্ষার ভিত্তিতে রবীন্দ্রবাবুদের লাইন যে মার্কস-সম্মত নয় এ তত্ত্ব প্রতিপন্ন করাই বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। রবীন্দ্রবাবুরা

মার্কসবাদ সম্পূর্ণ বর্জন করে যে লাইন এতদিন চালু রেখেছেন, তাতে প্রগতি সাহিত্যশিবিরের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। সেই ক্ষতি পূরণ করবার জন্যে, রবীন্দ্রবাবুদের লাইন সম্পূর্ণ বাতিল ক'রে সমালোচনা ও আত্মসমালোচনার ভিত্তিতে নতুন মার্কসবাদসম্মত লাইন নেওয়া অবশ্য কর্তব্য। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্র বাবুদের সাহিত্যিক বক্তব্যের রাজনৈতিক পটভূমি নিয়েই বিশেষ আলোচনা করা হবে।

আগেই বলা ভাল যে এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য প্রধানত নেতিমূলক— পূর্বপক্ষ খণ্ডন; উত্তরপক্ষ সমর্থন এর বর্তমান উদ্দেশ্য নয়। বারান্তরে অবশ্য উত্তরপক্ষ প্রতিষ্ঠা করার ইচ্ছা রইল।

রবীন্দ্রবাবু ও তাঁর শিষ্যদের মূল বক্তব্য দুটি। প্রথমত, তাঁদের বক্তব্য এই যে, ১৮৫৫—৫৯'এ যে সব গণ-বিদ্রোহ সংগঠিত হয়েছিল ভারতের মাটিতে—যেমন সিপাহী বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ প্রভৃতি, সেই, গণ-বিদ্রোহগুলিই ভারতবর্ষের প্রথম "বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব"। এ সব বিদ্রোহের বিপ্লবীরা যে 'মতাদর্শ' নিয়ে লড়েছিল তা ছিল 'নব জাগ্রত বুর্জোয়া শ্রেণী'র "কৃষক বুর্জোয়া"র মতাদর্শ। ভারতের ইতিহাসে এসব গণবিদ্রোহের অধ্যায়টাই প্রগতির অধ্যায় এবং প্রগতির উৎস খুঁজতে হলে এসব বিদ্রোহের ভেতরই খুঁজতে হবে। এসব গণ-সংগ্রামের ঢেউ এমন একটা প্রগতিশীল অধ্যায়ের সৃষ্টি করেছিল যে তার মর্মবাণী নিয়েই বাংলার প্রগতিশীল সাহিত্য রচিত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, বাংলার নবযুগ সম্পর্কে যে সাধারণ মত প্রচলিত ছিল সেই মত রবীন্দ্রবাবুরা মার্কসবাদ-বিরোধী বলে বাতিল করে দেন। রবীন্দ্রবাবু দেখান যে "বাংলার শিক্ষিত মধ্যশ্রেণী বাংলার নবজাগরণের নেতা", "ইংরেজী শিক্ষিত বুর্জোয়া শ্রেণীর 'মনস্বী'রা বাংলাকে সজাগ করেছে সর্বপ্রথম", এসব প্রচলিত ইতিহাস "মিথ্যা ইতিহাস"। দু'চার জন বাদে ইংরেজী শিক্ষিত বুর্জোয়াদের প্রতিনিধিরা বরাবরই প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকা নিয়েছেন, দেশকে এবং জাতিকে তাঁরা কিছুই দেন নি। রামমোহন, বঙ্কিম, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ— সাধারণ ভাবে যাঁদের বলা হয় বর্তমান বাংলার প্রগতিশীল ধারার উৎস, এঁরা [illegible] আসলে প্রতিক্রিয়ার বাহন, এ তত্ত্ব রবীন্দ্রবাবু প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। রবীন্দ্রবাবু ও তাঁর শিষ্যদের মতে অবস্থাপন্ন ইংরেজী শিক্ষিত মনস্বীরা কোন গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল ঐতিহ্য তৈরী করেন নি। জাতীয়তা প্রবর্তনের যে [illegible] তাঁরা করেন সে গৌরবের তাঁরা অধিকারী নন। বরং এই বুর্জোয়া শ্রেণী [illegible]



মনস্বীরা (যেমন বঙ্কিম-বিবেকানন্দ প্রভৃতি) বাংলার গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির হত্যাকারী। (১)

তাই রবীন্দ্রবাবুদের মূল বক্তব্য ছিল এই যে দীনবন্ধু-কালীপ্রসন্ন এবং দু'চারজনকে বাদ দিলে সাধারণ ভাবে ভারতবর্ষের ইংরেজী শিক্ষিত বুর্জোয়া শ্রেণীর লোকেরা ভারতীয় বিপ্লবী আন্দোলনের সমস্ত অধ্যায়ে প্রতিবিপ্লবী ভূমিকাই নিয়ে এসেছেন। রুশ বুর্জোয়াদের ভূমিকা রবীন্দ্রবাবুরা রুশ বিপ্লবের ইতিহাস থেকে পড়েছিলেন নিশ্চয়ই। কাজেই ইতিহাসের সেই নজিরের কথা মনে রেখে ভারতের ইংরেজীশিক্ষিত বুর্জোয়াদের সম্পর্কে রবীন্দ্রবাবু নতুন তত্ত্ব খাড়া করেছিলেন।

উনবিংশ শতাব্দীতে উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণী ইংরেজ শাসনের কুক্ষিতে জন্মগ্রহণ করে, তার শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে শুধু ধর্ম সংস্কার ও লোকহিতকর কাজে যোগ দেয়—অথচ ইংরেজ শাসনের এই প্রসাদপুষ্ট শ্রেণীর মনস্বীদেরই প্রগতির উৎস বলে ধরা হ'ত রবীন্দ্রবাবুর 'বিশুদ্ধ মার্কসবাদী' তত্ত্ব প্রকাশিত হবার আগে পর্যন্ত। ইতিহাসের উপর এই ব্যাভিচারের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রবাবু উদাত্ত কণ্ঠে সংগ্রামের আহ্বান জানান এবং "মার্কসবাদী"-র লাইন সম্পর্কে শেষ রায় দিয়ে দেন।

রবীন্দ্রবাবুদের সাহিত্যিক বক্তব্য মার্কসবাদসম্মত কিনা ঠিক করতে হলে তার আগে ঠিক করতে হবে যে তাঁদের রাজনৈতিক বক্তব্যের সাথে মার্কসবাদের মিল কতটুকু। প্রত্যেক মার্কসবাদীর আজ যে প্রশ্নগুলোর জবাব দিতে হবে সেগুলো হচ্ছে এই :—

(১) ১৮৫৫-৫৯এর ভারতীয় গণসংগ্রামগুলো "বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব" কিনা এবং এসব সংগ্রামের নেতৃত্ব কাদের হাতে ছিল?

(২) ১৮৫৫-৫৯এ ভারতের আর্থনীতিক-সামাজিক অবস্থা যা ছিল তাতে "কৃষক বুর্জোয়া"-র বিকাশ সম্ভব কিনা এবং আন্তর্জাতিক মার্কসবাদের এ বিষয়ে বক্তব্য কি?

(৩) ভারতবর্ষের বুর্জোয়াদের ভূমিকা কি ছিল? বাংলার ইংরেজী শিক্ষিত বুর্জোয়া শ্রেণীর 'মনস্বী'দের সাথে রুশদেশের উদারনৈতিক বুর্জোয়াদের সাদৃশ্য টানা মার্কসবাদসম্মত কিনা?

(১) মার্কসবাদী, পঞ্চম সংকলন, পৃঃ ১৪৬।

(৪) ঐতিহ্যবিচারে, প্রলেটারিয়ান আন্তর্জাতিকতার সঙ্গে স্বদেশপ্রেমের সমন্বয় সম্পর্কে, মার্কসবাদের শিক্ষা কি ?

(৫) বিপ্লব কোন্ শ্রেণী করে ? এবং
সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে পেটিবুর্জোয়াদের ভূমিকা কি ? পেটিবুর্জোয়ারা কি বিপ্লব-ভাঙাদের দলে, না পেটিবুর্জোয়ারা 'শ্রেণী' হিসেবে শ্রমিকশ্রেণীর ঘনিষ্ঠ সহযোগী ?

* * *

(১) ভারতীয় মুক্তি সংগ্রামে সিপাহী বিদ্রোহ, প্রভৃতির যে বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে —এসব বিদ্রোহে যে ভারতীয় জনতার অপূর্ব বীরত্ব মূর্ত হয়ে ওঠে, বিদেশী শোষণের বিরুদ্ধে নিষ্পেষিত কৃষক শ্রেণীর স্বতঃস্ফূর্ত ক্রোধ ও ঘৃণা, এসব বিদ্রোহে যেরকম আদিম, ব্যাপক রূপ নেয়, — তা প্রত্যেক মার্কসবাদীর পক্ষে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। মার্কস সিপাহী বিদ্রোহ সম্পর্কে বলেছিলেন যে এ বিদ্রোহে "জাতীয় চেতনার প্রথম সবল অভিব্যক্তি দেখা গেল"—(the first powerful manifestation of national conciousness.) (1)

ভারতীয় জাতীয় চেতনা বিকাশের, গণতান্ত্রিক সমাজ গড়বার যে দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে, তাতে সিপাহীবিদ্রোহ ও অন্যান্য গণবিদ্রোহ এক একটা বিশিষ্ট অধ্যায়। মার্কসবাদীদের এসব বিদ্রোহের 'শ্রেণীভিত্তি', 'মতাদর্শ' প্রভৃতি নিয়ে আরও আলোচনা করা দরকার। কিন্তু রবীন্দ্রবাবুদের বক্তব্য শুধু তাই নয়। তাঁদের বক্তব্য হল এই যে সিপাহী বিদ্রোহ প্রভৃতি ভারতের "বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব", এবং এদের নেতৃত্ব ফিউডাল রক্ষণশীল শ্রেণীর হাতে ছিল না। পাম দত্ত তাঁর 'আজিকার ভারতে' অবশ্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কথা বলেছেন। পাম দত্ত এসব অভ্যুত্থানের তাৎপর্য অস্বীকার করেন নি। কিন্তু একথা তিনি দেখিয়েছেন যে, "the rising of 1857 was in essential character and dominant leadership the revolt of the old, conservative and feudal forces and dethroned potentates for their rights and privileges, which they saw in process of destruction."

রবীন্দ্রবাবুরা পাম দত্তের এই বিশ্লেষণ বাতিল করেছেন, কারণ পাম দত্ত যে ইতিহাস লিখেছেন সেটা নাকি "মিথ্যা ইতিহাস—ইংরাজ শাসকবর্গের শেখানো কথা।" (২) কিন্তু মার্কস স্বয়ং সিপাহীবিদ্রোহের ব্যর্থতার কারণ আলোচনা

1. Marx's Notes – Nikolai Goldberg, "Communist" Feb. 1948. pp 394.
(২) মার্কসবাদী, ৫ম সংকলন, পৃঃ ১২৬।



করতে গিয়ে এর 'রক্ষণশীল' নেতৃত্বের কথা উল্লেখ করেছেন। মার্কস তাঁর Notes-এ লিখেছেন যে সিপাহী-বিদ্রোহের বিপর্যয় ঘটল দু'টো কারণে। প্রথমত, বিভিন্ন সামাজিক গ্রুপের মধ্যে বিভেদ ও অনৈক্য এবং দ্বিতীয়ত, ফিউডাল শ্রেণীর নেতৃত্বের বিশ্বাসঘাতকতা। সোভিয়েট ঐতিহাসিক গোল্ডবার্গ, মার্কসের Notes আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন, "The notes end with the story of that rebellion and its collapse which was due to the split between the main social groups that were active in it and the betrayal of the national cause by the *aristocratic leaders.*" (1)

কিন্তু রবীন্দ্রবাবুরা মার্কস কিংবা পাম দত্ত, কারও মতই গ্রহণ করেন নি। অন্যদিকে তাঁরা স্বকপোলকল্পিত তত্ত্ব খাড়া করেছেন। তাঁদের মতে সিপাহী বিদ্রোহ প্রভৃতি সামন্ততান্ত্রিক শৃঙ্খল ভেঙে বুর্জোয়া সমাজ প্রতিষ্ঠা করবার সংগ্রাম ; ভারতের "বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব" ; এবং এজন্যেই এদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব এত বেশী।

অথচ ইতিহাসের এমন অবাস্তব, মার্কসবাদ-বিরোধী ব্যাখ্যা অন্য কোন দেশে কোন মার্কসবাদীরা করেছেন কিনা ভাববার বিষয়। মার্কস শিক্ষা দিয়েছিলেন যে মানুষ খুশীমত ইতিহাস রচনা করতে পারে না। সমাজের বাস্তব উপকরণ তৈরী হয় নি অথচ ইতিহাস রচিত হচ্ছে, এ হচ্ছে ইতিহাসের ভাববাদী ব্যাখ্যা।

১৮৫৫-৫৯ ;—এসময়ের ভারতবর্ষের আর্থনীতিক-সামাজিক কাঠামো বিচার করলে দেখা যাবে যে ভারতের সমাজব্যবস্থায় তখন পর্যন্ত শিল্পপতি বুর্জোয়া শ্রেণীর বিকাশ প্রায় আরম্ভই হয় নি। প্রাচীন ভারতীয় সমাজ ভেঙে গেলেও, তখন পর্যন্ত মুৎসুদ্দি-বুর্জোয়া শ্রেণী ছাড়া, যন্ত্রশিল্প প্রবর্তনকারী দেশী বুর্জোয়া শ্রেণীর আবির্ভাব সবেমাত্র আরম্ভ হয়েছে। এ সময়ে বৃটিশ সওদাগর ধনিক শ্রেণী, দেশী জমিদার, মহাজন, মুৎসুদ্দি-বুর্জোয়া, কারিগর, শোষিত কৃষক—এ সব শ্রেণীই ছিল ভারতীয় অর্থনীতির বাস্তব বনিয়াদ। (২)

অথচ রবীন্দ্রবাবুরা ১৮৫৫-৫৯ এই "বুর্জোয়া"-দের খুঁজে পেয়েছেন এবং সিপাহী বিদ্রোহের "বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক" স্বরূপ আবিষ্কার করেছেন। ১৮৫৫-৫৯ সালে ভারতের সমাজব্যবস্থার বাস্তব উপকরণ যা ছিল তাতে 'বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব' সংগঠিত হতে পারে না। সেলভাঙ্কর, পাম দত্ত এবং অন্যান্য ঐতিহাসিকদের

1. Marx's Notes - Goldberg, 'Communist', Feb., 1948, pp 394
2. India To-day [Revised Edition] – R. Palme Dutta

বিশ্লেষণ থেকে অন্তত তাই জানা যায়। অথচ রবীন্দ্রবাবুরা তখনকার আর্থনীতিক-সামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণ না করেই "বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক" বিপ্লব আবিষ্কার করেছেন। "বুর্জোয়া" শ্রেণীর আবির্ভাব ও বিকশিত হবার আগেই "বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব" ঘটলো কেমন করে এ প্রশ্ন রবীন্দ্রবাবুরা এড়িয়ে গেছেন।

তাছাড়া যেটা আরও মারাত্মক কথা সেটা হচ্ছে এই যে "প্রাচ্য ভূ-খণ্ডে ১৯০৫ সাল থেকেই বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের যুগ আরম্ভ", লেনিনের এই সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করে রবীন্দ্রবাবুরা ১৮৫৫ সাল থেকে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব আবিষ্কার করেছেন। কমরেড লেনিন বলেছেন—"In western continental Europe the period of bourgeois-democratic revolution, embraces a fairly definite portion of time, approximately, from 1789 to 1871.

"In Eastern Europe and in Asia, the period of bourgeois-democratic revolutions only began in 1905." (1)

রবীন্দ্রবাবুরা যখন লেনিনের সিদ্ধান্ত বর্জন করতে দ্বিধা করেন না, তখন বুঝতে হবে যে মার্কসবাদ তাঁদের হাতে নিরাপদ নয়—তাঁরা নয়া মার্কসবাদ খাড়া করতে বদ্ধপরিকর।

মজা হচ্ছে এই যে, রবীন্দ্রবাবুরা বুর্জোয়া-জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে লড়বার জন্যে তাঁদের থিসিস খাড়া করেছিলেন। অথচ মার্কস কিংবা লেনিন যেসব স্বতঃস্ফূর্ত গণসংগ্রামের "বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক" চরিত্র আবিষ্কার করেন নি, তাদের ঐ স্বরূপ আবিষ্কার করে রবীন্দ্রবাবুরা চরম-জাতীয়তাবাদেরই অভিব্যক্তি দেখিয়েছেন। মার্কসবাদী মাত্রেই স্বতঃস্ফূর্ত গণবিদ্রোহের ঐতিহাসিক তাৎপর্য অনুধাবন করবেন। কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত গণবিদ্রোহ এক কথা, আর "বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব" অন্য কথা। এ দু'য়ের মধ্যে তফাৎ স্বীকার না করা মার্কসবাদসম্মত নয়। মার্কসবাদের নামে আসলে রবীন্দ্রবাবুরা অতীত ইতিহাসকে রোমান্টিক জাতীয়তাবাদীর দৃষ্টিভঙ্গীতেই দেখেছেন। কল্পনার পক্ষবিস্তার করে উনবিংশ শতাব্দীর গণসংগ্রামগুলিকে কাব্যময়, গীতধর্মী, জাতীয়তাবাদীর মত ব্যাখ্যা করেছেন। তাই দেখা যায় যে রবীন্দ্রবাবুদের বক্তব্যের সাথে অশোক মেহতা (২) সাভারকরের (৩) ১৮৫৭ সালের বিপ্লবের বিশ্লেষণে এত মিল।

1. Selected Works, vol. I. pp 572 - Lenin, Moscow Ed.
2. "1857-The Great Rebellion" - Ashok Mehta.
3. Indian War of Independence - V. D. Savarkar.



মার্কসবাদী ডায়লেকটিকের নিয়মে 'অতি-বাম' ও 'অতি-দক্ষিণ' যে শেষপর্যন্ত একজায়গায় এসে মেশে, রবীন্দ্রবাবুদের থিসিস্ তার আর একটা প্রমাণ।

(২) তাঁদের এই রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গীর জন্যে রবীন্দ্রবাবুরা আবিষ্কার করেছিলেন যে উনবিংশ শতাব্দীর গণবিদ্রোহগুলি ছিল "কৃষক-বুর্জোয়ার বিদ্রোহ"। তার মানে এই যে ১৮৫৫ সাল থেকে ভারতের মাটিতে ধনীকৃষক—কুলাকদের জন্ম হয়েছিল। কিন্তু কলোনীতে 'কুলাক শ্রেণী-বিকাশ-এর তত্ত্বও মার্কসবাদ-বিরোধী। রবীন্দ্রবাবুরা নিশ্চয়ই এ তত্ত্ব অন্য কোন উৎস থেকে আহরণ করে থাকবেন। কারণ ১৯২৮ সালেও কমিনটার্নের শিক্ষা হল এই যে সাম্রাজ্যবাদের শোষণে উপনিবেশের কৃষিতে ধনতন্ত্রের প্রকৃত বিকাশ হতে পারে না, কুলাক শ্রেণীর জন্মও হয় না। সাম্রাজ্যবাদ যে কুলাক শ্রেণী কিছুটা স্থাপন করতে চায় না এমন নয়। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের আভ্যন্তরীণ সংকট এমনই যে এ' প্রচেষ্টা ফলবতী হয় না কখনও। বাস্তবে, অধিকাংশ কৃষক নিঃস্ব হতে থাকে—দেশীবাজার হয়ে পড়ে আরও সংকুচিত; 'ধনতন্ত্র', "কুলাক শ্রেণী"র বিকাশ সাম্রাজ্যবাদের আওতায় আর হয়ে ওঠে না।(1)

আন্তর্জাতিকের এই শিক্ষা অমান্য করে রবীন্দ্রবাবুরা ১৮৫৫ সালেই কি করে "কৃষক-বুর্জোয়াদের" খুঁজে পেলেন? উপনিবেশের কৃষিব্যবস্থায় ধনতন্ত্রের বিকাশ, কুলাক শ্রেণীর আবির্ভাব, এসব কাদের তত্ত্ব? এ তত্ত্ব ত মার্কসবাদের নয়। উপনিবেশের বেলায় মার্কসবাদ, সাম্রাজ্যবাদের এ ধরনের কোন ভূমিকা ত কখনও স্বীকার করে নি। সাম্রাজ্যবাদের দৌলতে 'সামন্ততান্ত্রিক', 'প্রাক-ধনতান্ত্রিক' শোষণই যে কৃষিতে ক্রমশঃই প্রবল হয়ে ওঠে, এটাইত মার্কসবাদের শিক্ষা। তবে 'কৃষক বুর্জোয়া তত্ত্ব' রবীন্দ্রবাবুরা কোথা থেকে পেলেন? আশ্চর্যের কথা এই যে এ তত্ত্বটি আন্তর্জাতিক ট্রটস্কীবাদের একটি অমূল্য সম্পদ! ১৯২৭ সালে ট্রটস্কীবাদীরা চীনের কৃষিতে 'ধনতন্ত্র' আবিষ্কার করেছিল, "কৃষক-বুর্জোয়া"-র তত্ত্ব নিয়েমার্কসবাদীদের সঙ্গে লড়াই তাদের কম হয় নি। ট্রটস্কীবাদের মতে চীনের বিপ্লবের আসল শত্রু ছিল 'ধনতন্ত্র', সামন্ততন্ত্র নয়। ট্রটস্কীবাদীদের বৈশিষ্ট্যই হল যে তারা ঔপনিবেশিক দেশের আর্থনীতিক অবস্থা বিশ্লেষণ না করে, 'ধনতন্ত্র', 'কৃষক বুর্জোয়া'র স্বপ্ন দেখে (2)। রবীন্দ্রবাবুরা বোধহয় এই ট্রটস্কীবাদীদের

1. Revolutionary Movement in Colonies - PPH Edition pp 16.
2. On China - Stalin. "Marxism and the National & Colonial Question."

তত্ত্বের উদ্গাতা হয়েছেন ভারতবর্ষে। তা' না হলে ১৮৫৫ সালের ভারতের সমাজবিন্যাসে' কৃষক-বুর্জোয়া' তাঁরা আবিষ্কার করলেন কেন ?

*   *   *   *   *

( ৩ ) ভারতবর্ষের প্রগতিশিবিরে আজ যে সংকট দেখা দিয়েছে তার একটা কারণ হল এই-যে মার্কসবাদের নামে এতদিন নানা রকমের মার্কসবাদ-বিরোধী তত্ত্ব খাড়া করা হয়েছে। দরকার মত মার্কস, লেনিন, স্টালিনের লেখা কদর্থ করে আন্তর্জাতিক মার্কসবাদী নেতাদের কুৎসা রটনা করে, নিজেদের মনগড়া থিসিস্ "বিশুদ্ধ মার্কসবাদে"-র নামে চালিয়ে যাওয়া হয়েছে। ভারতের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিশেষ বিশেষ অধ্যায়ের বাস্তব, মার্কসবাদসম্মত ব্যাখ্যা না করে, যান্ত্রিকভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, উনবিংশ শতকের গণ-বিদ্রোহগুলিই "বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব"। গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল আন্দোলনের উদ্ভব ও ক্রমপরিণতি এ আন্দোলনের 'মতাদর্শে'র বিকাশে শিক্ষা-আন্দোলন, সমাজ সংস্কার, ধর্ম আন্দোলন প্রভৃতির স্থান ; গণতান্ত্রিক সমাজ গঠনের বহুমুখী প্রচেষ্টা—এ সব প্রশ্নের মার্কসবাদী আলোচনা না করে সরাসরি বলা হয়েছে যে সিপাহী বিদ্রোহ প্রভৃতির মাধ্যমেই শুধু গণতান্ত্রিক সমাজ গড়বার প্রচেষ্টা হয়েছিল—তারপর বাংলার ইতিহাসে কেবল প্রতিবিপ্লবের যুগ।

বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে আদর্শগত সংগ্রামের নাম করে রবীন্দ্রবাবুরা ভারতের মুক্তি আন্দোলনের ক্রমপরিণতির ইতিহাস স্বীকার করেন নি। তাঁদের মতে ১৮৫-৫৯'এর পর ভারতবর্ষের ইতিহাস স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। বাংলার মধ্য শ্রেণীর নেতৃত্বে সংগঠিত আন্দোলনের 'গণতান্ত্রিক' তাৎপর্য রবীন্দ্রবাবুরা তাই সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন। তাই রবীন্দ্রবাবুরা দ্বিধাহীনভাবে বলতে পারেন যে ১৯০৫ সালের আন্দোলন ১৮৫৭ সালের আন্দোলনেরই "দুর্বলতর পুনরভিনয়"। (1) কাজেই লেনিন ১৯১৩ সালে যেখানে ঘোষণা করেন যে "সারা এশিয়া জুড়ে এক বিরাট গণতান্ত্রিক আন্দোলন ক্রমশঃই বিস্তৃত হচ্ছে এবং শক্তি সঞ্চয় করছে"।

"Everywhere in Asia a mighty *democratic* movement is growing, spreading and gaining strength," (2)

—যেখানে রবীন্দ্রবাবুরা এসব আন্দোলনের মধ্যে কোন প্রগতিশীল দিকই খুঁজে পান না ; প্রগতির উৎস সন্ধান করতে গিয়ে তাঁদের ১৮৫৫-৫৯'

1. মার্কসবাদী—পঞ্চম সংকলন, পৃষ্ঠা ১৪২।
2. Backward Europe and Progressive Asia. 1913 - Lenin.



এই যুগটাতেই শুধু পৌঁছাতে হয়। আসল কথাটা হচ্ছে এই যে রবীন্দ্রবাবুদের মতে ১৮৮০ থেকে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত যে আন্দোলন তাতে "মুহু চাওয়া ও পাওয়া"ই শুধু দেখা গেছে—"সশস্ত্র গণঅভ্যুত্থান" এসময়ে ঘটে নি ; কাজেই এসব আন্দোলনে প্রগতির দিক একেবারেই নেই। তাছাড়া বুর্জোয়া নেতৃত্বে সংঘটিত এসব আন্দোলনের প্রগতিশীল ভূমিকা রবীন্দ্রবাবুরা স্বীকার করবেন কি করে! ভারতীয় বুর্জোয়ারা তো "চিরকালই" প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকা নিয়ে এসেছে। কাজেই এই বুর্জোয়া নেতৃত্বে সংঘটিত আন্দোলনের কোনও 'প্রগতিশীল' দিক "বিশুদ্ধ মার্কসবাদী" রবীন্দ্রবাবুরা তো মানতে পারেন না!

কমরেড মাও সে-তুঙ তাঁর "নয়া গণতন্ত্রে" চীনা বিপ্লবের প্রথম অধ্যায়ে যে সমস্ত সংগ্রাম ঘটেছিল তার প্রত্যেকটির তাৎপর্য স্বীকার করেছেন। ১৯০৮ সালের "সংস্কারপন্থী আন্দোলন"-কে তিনি "প্রতিক্রিয়াশীল" নাম দিয়ে, রবীন্দ্র বাবুদের কায়দায়, বাদ দেন নি। তাঁর মতে আফিম যুদ্ধ (১৮১৯-২৪) থেকে আরম্ভ করে, ১৯২৫ সালের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম, জাপান-বিরোধী যুদ্ধ—ঐসবই কোন না কোন দিক থেকে, বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন পরিমাণে, স্বাধীন, গণতান্ত্রিক সমাজ গড়বার সংগ্রাম এবং এদের প্রত্যেকেটিরই ঐতিহাসিক তাৎপর্য রয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রবাবুরা ভারতবর্ষের বেলায় অন্য ধরনের ভাষ্য খাড়া করেছেন। বাংলার নবজাগরণে রামমোহনের অবদান (১৮১৪-৩৩) রবীন্দ্রবাবুরা এক কলমের খোঁচায় বাতিল করে দিয়েছেন। সিপাহী বিদ্রোহের পর, কংগ্রেস স্থাপন থেকে অসহযোগ আন্দোলন পর্যন্ত সমস্ত জাতীয় আন্দোলন যে প্রকৃতিগত দিক থেকে 'গণতান্ত্রিক' সমাজ গড়বার সংগ্রাম, রবীন্দ্রবাবুরা ঐ ইতিহাস স্বীকার করেন নি। চীন ও ভারতবর্ষ—দুই-ই সামন্ততান্ত্রিক, ঔপনিবেশিক দেশ। তাদের মধ্যে তফাৎ আছে নিশ্চয়ই, কিন্তু সে তফাৎ এমন নয় যে ভারতবর্ষের "সংস্কারপন্থী আন্দোলন", "স্বদেশী আন্দোলন" সব কিছুকেই ইতিহাসের ডাষ্টবিনে নিক্ষেপ করতে হবে। রবীন্দ্রবাবুদের বক্তব্য কিন্তু তাই। তাঁদের মতে ভারতবর্ষের প্রগতিশীল আন্দোলন শুধু একবারই হয়েছিল, ১৮৫৫-৫৯'এর রক্তাক্ত গণবিদ্রোহের রাস্তায়। সম্প্রতি শ্রমিক-শ্রেণীর নেতৃত্বে আবার বিপ্লবী লড়াই আরম্ভ হয়েছে। মাঝখানে ভারতের ইতিহাসে অন্ধকারের যুগ—'প্রতিক্রিয়াশীলতা' ও 'আত্মসমর্পণ'ই সে যুগের একমাত্র পরিচয়।

ইতিহাসের এরকম বিকৃত ব্যাখ্যার নাম ডিমিট্রভ দিয়েছিলেন 'জাতীয় সন্ত্রাসবাদ'—national nihilism (1) রবীন্দ্রবাবুরা সে পথই ধরেছেন। তাই রামমোহন-বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথের মধ্যে কোন প্রগতিশীল ঐতিহ্যই তাঁরা খুঁজে পান না। যান্ত্রিকভাবে তাই তাঁরা দেখান যে, বিবেকানন্দ ছিলেন ইংরেজ শাসনের ভক্ত, রাজনৈতিক মতাদর্শের দিক থেকে স্বেচ্ছাতন্ত্রের সমর্থক। রবীন্দ্রবাবু তাই ঘোষণা করেন যে বিবেকানন্দের ধর্মসংস্কার আন্দোলন উনবিংশ-শতাব্দীর পটভূমিকায় শুধু প্রতিক্রিয়াশীল। ঘোষণা করেন যে, রামমোহন, বঙ্কিম, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ—এঁরা ইংরেজ সরকারের প্রসাদপুষ্ট,—প্রতিক্রিয়ার শক্তির প্রত্যক্ষ পার্টিসান্; এদের 'মন্ত্র' প্রতিক্রিয়ার শক্তিকেই শক্তিশালী করে তুলেছে, প্রগতির শক্তিকে নয়,—এসব তথাকথিত 'মনস্বীরা' ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রেরণা সৃষ্টি করেন নি—এঁরা ছিলেন ভারতের প্রতিক্রিয়ার শিবিরের অংশীদার। সেজন্যই রবীন্দ্রবাবুদের বলতে হয়, মীরজাফর ইংরেজ-বণিকের মানদণ্ডকে রাজদণ্ডে পরিণত করতে সাহায্য করেছিল আর রামমোহন রায় সেই রাজদণ্ডকে দীর্ঘস্থায়ী করবার জন্যে বিদেশী বণিকদের সাথে কোলাবরেশন করেছেন (2)। ঠিক একই কারণে বিবেকানন্দকে গোলওয়ালকারের গুরু বলে রবীন্দ্রবাবুরা গাল দেন (3), রবীন্দ্রনাথের মতের সঙ্গে হিন্দুমহাসভা ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবকদের মতের কোন পার্থক্য দেখতে পান না। (4)

তর্কের খাতিরে যদি ধরে নেওয়া যায় যে বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথ এঁরা সব ভারতীয় বুর্জোয়াদের মুখপাত্র—পেটিবুর্জোয়াদের নয়, তবুও রবীন্দ্রবাবুদের থিসিস কিন্তু একেবারেই প্রমাণ হয় না। "ভারতীয় বুর্জোয়ারা সব সময় শুধু প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকাই নিয়েছে" এ সূত্র যদি ঠিক হত, তাহলে বুর্জোয়াদের সাংস্কৃতিক-সাহিত্যিক প্রতিনিধিদের মতাদর্শে প্রতিক্রিয়া ছাড়া অন্য কিছুই থাকত না। কিন্তু কলোনির বুর্জোয়াদের ভূমিকা সম্পর্কে রবীন্দ্রবাবুদের মূলসূত্রই হচ্ছে একান্তভাবে মার্কসবাদ-বিরোধী। বুর্জোয়াদের ভূমিকা সম্পর্কে রবীন্দ্রবাবুদের তত্ত্ব ষোলআনা ট্রটস্কীবাদী তত্ত্ব। এই ট্রটস্কীবাদী তত্ত্ব থেকে আরম্ভ করেছেন বলেই তাঁরা বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের নামে সব রকমের 'জাতীয়তা,' 'স্বদেশপ্রেম' বর্জন করবার রাস্তা ধরেছেন

1. Workingclass against Fascism - Dimitrov.
2. মার্কসবাদী, পঞ্চম সংকলন, পৃ ১৬৪
3. ঐ পৃ ১৪০
4. ঐ পৃ ১৪৯



মার্কসবাদীরা অবশ্যই জনসাধারণের সাথে একাত্ম হয়ে তাদের এই শিক্ষাকে তরান্বিত করে তুলবেন, জনসাধারণের অব্যক্ত প্রচেষ্টাকে সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি দেবেন, প্রকাশিত করে তুলবেন। তা না হলে মার্কসবাদী স্বতঃস্ফূর্ততার কবলে গিয়ে পড়বেন, জনসাধারণের উপর বুর্জোয়া মতাদর্শের প্রভাব তাতে বেড়েই যাবে। এ সবই সত্যি এবং মার্কসবাদসম্মত, কিন্তু রবীন্দ্রবাবুদের ঐতিহ্যবিচারের মূল কথা তা নয়। 'বুর্জোয়া সংস্কারপন্থী' ও 'হিন্দু রিভাই-ভালিষ্ট'দের বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে গিয়ে তাঁরা ভারতের প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির সবটুকু বাদ দিয়ে বসে আছেন। সমস্ত রকমের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও, যাঁরা ভারতের নবজাগরণের নেতা, তাঁদের ঐতিহাসিক ভূমিকা স্বীকার করেন নি। শ্রেণীসংগ্রামের নামে, প্রলেটারিয়ান আন্তর্জাতিকতার নামে, তাঁরা গণতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় চেতনা বিকাশে যাঁরা সাহায্য করেছেন, তাঁদের প্রচেষ্টার গুরুত্ব একেবারেই স্বীকার করেন নি। অথচ ডিমিট্রভ বহু আগে পরিষ্কার করে প্রলেটারিয়ান আন্তর্জাতিকতার সঙ্গে স্বদেশপ্রেমের সম্পর্ক কি, এ সম্বন্ধে আলোচনা করে গেছেন। ডিমিট্রভ বলেছেন, যে এ' দুয়ের মধ্যে বাস্তবিকই কোন বিরোধ নেই, এ দুয়ের সার্থক সমন্বয়ে কোনটিরই গৌরবহানি হয় না, বরং প্রতিষ্ঠা বাড়ে। (1)

শ্রমিক শ্রেণী ও তার সহযোগী শ্রেণীরা যে আজ নতুন, প্রগতিশীল সমাজ গড়বার জন্যে সংগ্রাম চালাচ্ছে, যে গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, নানাভাবে কোন না কোন পরিমাণে, আগেও হয়েছে, যদিও ঐতিহাসিক কারণে, সে সংগ্রাম সফল হতে পারে নি। আজ ভারতবর্ষের অচলায়তন, ঔপনিবেশিক সমাজের ধ্বংসাবশেষের উপর নতুন প্রগতিশীল সমাজ গড়ে তোলাই শ্রমিক শ্রেণী ও তার সহযোগীদের ঐতিহাসিক দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তাঁরা নিশ্চয়ই অতীত সংগ্রামের প্রগতিশীল দিকটুকু গ্রহণ করবে, যে সমস্ত মনস্বীরা ধর্ম-মোহের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন, সামাজিক কুসংস্কার রদ করবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন, জীবনের জয়গান যাঁদের কণ্ঠ থেকে উৎসারিত হয়েছিল, ব্যক্তিস্বাধীনতার জন্যে যাঁরা সংগ্রাম করেছিলেন আজীবন নিজেদের জীবনে তাঁদের মহত্ত্ব, তাঁদের গৌরব, শ্রমিকশ্রেণী ও তার সহযোগীরা অস্বীকার করবে না। রবীন্দ্রবাবুদের মত তাঁরা আন্তর্জাতিকতার নামে 'স্বদেশপ্রেম', নিজেদের পূর্বপুরুষদের অতীত গৌরব মুছে ফেলবেন না। বরং প্রলেটারিয়ান

1. Working class against Fascism - Dimitrov.

ঘোষণা করেছিলেন যে, ভারতবর্ষে নতুন বৈশিষ্ট্য যা দেখা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে এই যে "the *compromising section* of the bourgeoisie has already managed in the main to come to an agreement with Imperialism," (1) কিন্তু রবীন্দ্রবাবুরা বলেছেন অন্য কথা। ১৯০৮ সালে, বুর্জোয়ারা প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে জনতার শিবিরের পার্টিসান ছিল, লেনিনের এ কথা তাঁরা স্বীকার করেন নি। ১৯২৫-এ ষ্টালিনের শিক্ষা থেকে দেখা যায় যে ঐ সময়ে (১৯২১ থেকে) বড় বুর্জোয়ারা সাম্রাজ্যবাদের সাথে একটা সমঝোতায় এসে গেছে। কিন্তু রবীন্দ্রবাবুদের বক্তব্য তা নয়। ভারতীয় বুর্জোয়ারা সমগ্রভাবে চিরকাল অর্থাৎ ১৯০৫, ১৯০৮, ১৯২০, সবসময়ে ইংরেজের সঙ্গে রফা করে বেড়ে উঠেছে—তাদের কোনদিন প্রগতিশীলতা ছিল না, এটাই রবীন্দ্রবাবুদের মূল তত্ত্ব। অথচ এ তত্ত্ব মার্কসবাদে কোথাও পাওয়া যাবে না।

১৯২৮ সালে কমিনটার্ন পরিষ্কার ঘোষণা করেছিল যে ঔপনিবেশিক বুর্জোয়াদের ভূমিকা হল, national reformist, অর্থাৎ "জাতীয় সংস্কারপন্থী"। "বুর্জোয়ারা শুধুই প্রতিক্রিয়াশীল", এ তত্ত্ব কমিন্টার্নের মতে সংকীর্ণতা-দোষে দুষ্ট। আর "বুর্জোয়ারা জাতীয় বিপ্লবী" এ তত্ত্ব tailist অর্থাৎ লেজুড় মনোভাবের পরিচায়ক। কমিনটার্ন এ দুটো বিচ্যুতি সম্পর্কেই মার্কসবাদীদের সাবধান করে দিয়েছিল। কিন্তু কমিনটার্নের সাবধানবাণী না শুনে রবীন্দ্রবাবুরা প্রথম ভুলটা করে যাচ্ছেন। ভারতের বুর্জোয়াদের 'জাতীয় সংস্কারপন্থী' ভূমিকা স্বীকার না করে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের মত তাদের "প্রতিক্রিয়াশীলতা"টাই তাঁরা আবিষ্কার করেছেন। (2)

অথচ রবীন্দ্রবাবুরা ভারতীয় বুর্জোয়াদের ভূমিকা বিশ্লেষণে কমিনটার্ন সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছেন; রুশ-বুর্জোয়াদের সাথে তাদের এক ব্রাকেটে ঢুকিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছেন।

শীতাংশুবাবু যে বলেছেন, ভারতবর্ষের বুর্জোয়ারা অন্যান্য স্বাধীন দেশের বুর্জোয়াদের মত সত্যই কোনদিন প্রগতিশীল ছিল না একথা সত্য। কোন মার্কসবাদী দাবি করেছেন যে ১৬৮২'র বা ফরাসী বিপ্লবের বুর্জোয়াদের ভূমিকা আর ভারতবর্ষের বুর্জোয়াদের ভূমিকা অভিন্ন? কিন্তু এর থেকে সিদ্ধান্ত করা চলে না যে, ভারতবর্ষের বুর্জোয়াদের ভূমিকা শুধুই প্রতিক্রিয়াশীল, রুশ বুর্জোয়া-

1 Toilers of the East - Stalin
2 Revolutionary Movement in Colonies, PPH Edition pp24-27



দের মত। অথচ নানারকম কথার মারপ্যাঁচের আড়ালে রবীন্দ্রবাবুদের আসল বক্তব্যটা তাই। ষ্টালিন বলেছেন সাম্রাজ্যবাদী দেশের বুর্জোয়াদের সাথে কলোনির বুর্জোয়াদের এক করে দেখা ট্রটস্কীবাদেরই বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রবাবুদের কাণ্ডকারখানা দেখলে সন্দেহ থাকে না যে, তাঁরা সজ্ঞানে মার্কসবাদ বর্জন করে ট্রটস্কীবাদী নীতির উপাসক হয়ে উঠেছেন।

১৯২৭ সালে ষ্টালিন ট্রটস্কীবাদীদের তত্ত্ব খণ্ডন করতে গিয়ে বলেছিলেন, "সাম্রাজ্যবাদী দেশের বিপ্লব এক জিনিস; এসব দেশের বুর্জোয়াশ্রেণী বিদেশের জনগণের উৎপীড়ক; এই বুর্জোয়ারা বিপ্লবের সব স্তরেই প্রতিবিপ্লবী। ঔপনিবেশিক ও পরাধীন দেশের বিপ্লব অন্য জিনিস; এসব দেশের জাতীয় বুর্জোয়ারা একটা বিশেষ স্তরে এবং একটা বিশেষ সময়ের জন্য সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিপ্লবকে সমর্থন করে।..."

"বিরোধী পক্ষের মূল ভ্রান্তি হল তাঁরা এ দুধরনের বিপ্লবের প্রভেদটা বোঝেন না এবং কিছুতেই স্বীকার করেন না।" (1)

ষ্টালিনের এই নীতি অনুসারে ভারতীয় ঔপনিবেশিক বুর্জোয়াদের স্বভাব রবীন্দ্রবাবুরা যে ভাবে চিত্রিত করেছেন তা কখনও সত্য হতে পারে না। বুর্জোয়াদের "জাতীয় সংস্কারপন্থী" চরিত্র স্বীকার করে রবীন্দ্রবাবুরা যদি সাহিত্যবিচারে নামতেন তা হলে মার্কসবাদীদের কৃতজ্ঞতা তাঁরা অর্জন করতেন। কিন্তু "ভারতীয় বুর্জোয়ারা প্রতিক্রিয়াশীল সব সময়ে" এই ট্রটস্কীবাদী রাজনৈতিক সূত্র থেকে তাঁরা সাহিত্য বিচারে নেমেছিলেন; কাজেই তাঁদের সাহিত্য বিচার যে ট্রটস্কীবাদের স্পর্শে কলুষিত হয়ে গেছে একথা মানতেই হবে।

আগেই বলা হয়েছে যে রবীন্দ্রবাবুরা আসলে রুশদেশের উদারনৈতিক-বুর্জোয়াদের সঙ্গে ভারতের ইংরেজীশিক্ষিত মনস্বীদের সাদৃশ্য টানতে চেয়েছেন। সোজাসুজি তাঁরা এ কাজটা করেন নি; কারণ মার্কসবাদীরা তাহলে সহজেই তাঁদের ট্রটস্কীবাদী তত্ত্বটা ধরে ফেলত। তাই রুশবুর্জোয়াদের নাম না করে বড় বড় কথার আড়ালে, তাঁরা এই বহুনিন্দিত ট্রটস্কীবাদী তত্ত্বটি পেশ করেন। বুর্জোয়া জীবনবেদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার 'বিপ্লবী' বুলি আউড়ে ভারতের ইংরেজীশিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর প্রতিভূদের, প্রতিক্রিয়ার শিবিরের অংশীদার বলে

Marxism and the National and Colonial Question - Stalin, pp 196

ঘোষণা করেন। অথচ চীনের প্রশ্ন আলোচনা করতে গিয়ে ষ্টালিন ট্রটস্কীপন্থীদের উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, "But the opposition forget that only people who do not understand and will not admit that there is a difference between revolution in oppressed countries and revolution in oppressing countries can talk like this, that only people for taking Leninism and joinning the followers of the Second International, can talk like this." (1)

ট্রটস্কীবাদীদের বক্তব্য কি ছিল? তাদের বক্তব্য ছিল রুশদেশে যখন উদারনৈতিক বুর্জোয়ারা সব অধ্যায়ে প্রতিবিপ্লবী ভূমিকা নিয়েছে, তাদের যখন শত্রুতার সম্পর্ক, তখন চীনের বেলায় তা হবে না কেন? ষ্টালিন বলেছিলেন, কারণ "The liberal bourgeoisie of an *imperialist country* is bound to be counter-revolutiony," কিন্তু "at a certain stage of its devolopment the national bourgeoisie in the colonial countries may support the revolutionary movement of its country against imperialism." (2) অর্থাৎ ট্রটস্কীবাদীরা চীনের বেলায় যে ভুল করেছিল, রবীন্দ্রবাবুরা ভারতের বেলায় গুরুর সেই ভুলই করে যাচ্ছেন; কলোনির বুর্জোয়াদের সম্পর্কে লেনিনবাদী তত্ত্ব মানবেন না এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

রবীন্দ্রবাবুরা কলোনির বিপ্লবী আন্দোলনের তিন স্তর নিশ্চয়ই স্বীকার করেন না। ষ্টালিনের শিক্ষা হল যে, (3) প্রথম অধ্যায়ে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় যুক্ত ফ্রন্টের স্তরে, জাতীয়-বুর্জোয়া বিপ্লবী আন্দোলনকে সমর্থন করে। কিন্তু দ্বিতীয় স্তরে, বড় বুর্জোয়ারা বিপ্লবের ভয়ে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপস করে বিপ্লবকে বানচাল করে দেবার চেষ্টা করে। তৃতীয় স্তরে, কলোনিতে গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন হবার পর, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সম্ভাবনা দেখা দেয়, তার আগে নয়। ভারতবর্ষে ১৯২১ থেকেই বড় বুর্জোয়ারা আত্মসমর্পণ করতে আরম্ভ করেছিল, যে আত্মসমর্পণের ইতিহাসের পরিসমাপ্তি হল ১৯৪৭ সালে। কিন্তু ১৯০৫ থেকে ১৯২০ পর্যন্ত, ভারতীয় জাতীয় বিপ্লবী আন্দোলনের প্রথম

1. On China,—Stalin, "Marxism and t he National & Colonial Question."
2. ঐ
3. ঐ



স্তরে, বুর্জোয়ারা বিপ্লবী আন্দোলনের সমর্থন করেছিল। ১৮৮৫ থেকে ১৯০৫ পর্যন্তও বুর্জোয়ারা প্রতিবিপ্লবী হয়ে যায় নি। ষ্টালিনের নীতি অনুযায়ী ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের এই হবে পরিচয়, বুর্জোয়াদের ভূমিকা সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত। কিন্তু রবীন্দ্রবাবুরা যে তত্ত্ব খাড়া করেছেন, অর্থাৎ ভারতের বুর্জোয়ারা বরাবরই প্রতিবিপ্লবী; সে তত্ত্ব মার্কসবাদী তত্ত্ব নয়, ষ্টালিনের শিক্ষার সাথে তার কোন মিল নেই।

( ৪ ) আগেই বলা হয়েছে যে রবীন্দ্রবাবুরা বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ছুতো ধরে জাতীয় সন্ত্রাসবাদের পথ ধরেছেন। ঐতিহ্য বিচারে স্টালিন-ডিমিট্রভের শিক্ষা বর্জন করে, মাও-এর পদ্ধতি অনুসরণ না করে জাতীয় জীবনের অতীত ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়কে, জাতীয় জীবন গড়ে তোলায় যে সব মনস্বীর অবদান সামান্য নয়, তাঁদের প্রতিক্রিয়াশীলতার অপবাদে ছেঁটে বাদ দিয়েছেন। সমাজ-সংস্কার ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে, প্রগতির জন্য যে সব সংগ্রাম হয়েছে তাদের তাৎপর্য একেবারেই স্বীকার করেন নি। বিশেষ বাস্তব অবস্থায় রামমোহন প্রভৃতি পশ্চিমী বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির ভক্ত কেন হয়েছিলেন, তাঁদের আন্দোলনের মাধ্যমে যে প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক ধারা তখনকার দিনে রূপ পাচ্ছিল, এসব প্রশ্ন অবান্তর বলে তাঁরা বাদ দিয়েছেন। বিবেকানন্দের আপাত-দৃষ্টিতে অরাজনৈতিক ধর্ম-আন্দোলনের পেছনে যে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ভাবাদর্শ কাজ করছিল, যার জন্য তিনি আওয়াজ তুলেছিলেন, "জাতিকে বাঁচাতে গেলে জনতার ও নারীজাতির মুক্তি চাই", রবীন্দ্রবাবুদের চোখে এসবের কোন দাম নেই। রবীন্দ্রনাথের মতাদর্শে যে মানবতা (humanism), মানবমহত্ব, আশা ও আনন্দের সুর, ব্যক্তিস্বাধীনতার জয়গান মূর্ত হয়ে উঠেছিল, রবীন্দ্রবাবুরা এ সব কিছুকেই বাতিল করেছেন প্রতিক্রিয়াশীলতার অপবাদে। মার্কসবাদী ঐতিহাসিকের কাছে ঐতিহ্য বিচারে যে নিষ্ঠা ও দায়িত্বজ্ঞান প্রত্যাশা করা স্বাভাবিক, সে নিষ্ঠা ও দায়িত্বজ্ঞান রবীন্দ্রবাবুরা একেবারেই বর্জন করেছেন। সংস্কারবাদীরা ঘোষণা করে, "রামমোহন-বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথ—এরাই বাংলার নবযুগের স্রষ্টা; এদের পথ অনুসরণ করলেই ভারতের মুক্তি।" রবীন্দ্রবাবুরা এই আংশিকতা-দোষদুষ্ট বিশ্লেষণের বিরুদ্ধে লড়বার জন্যে ঘোষণা করলেন, "এরা জাতীয় জীবনে প্রতিক্রিয়াশীল ভাবধারারই শুধু বাহক; এদের বাদ দিয়েই প্রগতিশিবিরকে অগ্রসর হতে হবে।" কিন্তু এ দুটো বিশ্লেষণই যান্ত্রিক, অনৈতিহাসিক।

অথচ চীনের ঐতিহ্য বিচার, মাও যে ভাবে করেছেন, রবীন্দ্রবাবুদের তা
হাতের কাছেই ছিল। 'গণরাষ্ট্রের একনায়কত্ব' (1) প্রবন্ধে কমরেড মাও ১৮৪০
থেকে ১৯০০ পর্যন্ত চীনের প্রগতিপন্থীরা কি ভাবে চিন্তা করতেন, তার সুনিপুণ
বিশ্লেষণ করেছেন। ঐ আমলের প্রগতিকামীদের 'বুর্জোয়া গণতন্ত্রে'র ওপর যে
আস্থা ছিল, তার দুর্বলতা, ত্রুটি তিনি দেখিয়েছেন, কিন্তু ঐতিহাসিক হিসাবে
এটাও তিনি দেখিয়েছেন, যে তখনকার বাস্তব অবস্থায় চীনা নব্যপন্থীদের
দৃষ্টিভঙ্গী স্বাভাবিক ছিল। প্রলেটারিয়ান আন্তর্জাতিকতাবাদের নামে তিনি
চীনের জাতীয় জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়গুলিকে, বুর্জোয়া ভাবধারার বাহক
নব্যপন্থীদের, 'প্রতিক্রিয়াশীল' বলে হেয় করেন নি।

মাওয়ের বিশ্লেষণ পদ্ধতি অনুসরণ করে একথা আমরা নিশ্চয়ই বলব যে
আমাদের পূর্বপুরুষেরা, 'জাতীয়সত্তা' পুনঃপ্রতিষ্ঠার পথ কি হবে, ভারতীয় সমাজের
প্রগতি কোন রাস্তায় হবে এসব সম্পর্কে কোন নির্ভুল সিদ্ধান্ত করতে পারেন নি।
১৮১৪ থেকে ১৯১৭ সালের আগে পর্যন্ত, আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পরিস্থিতির
পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে দেখা যাবে যে, ভারতের প্রগতিশীল ধারার যাঁরা
বাহক তাঁরা সকলেই পশ্চিমী বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির ভক্ত ছিলেন, কোন না
কোন দিক থেকে বিভিন্নভাবে। সমাজ সংস্কারই হোক, শিক্ষা আন্দোলনই
হোক, ধর্ম আন্দোলনই হোক,—এসবের মধ্যে একই সুর, "পশ্চিমী গণতন্ত্রের
কাছ থেকে শেখো, সমাজকে নতুন করে গড়ে তোল বুর্জোয়া রাষ্ট্রের ছাঁচে।"
রবীন্দ্রবাবুরা যাঁদের বলেছেন "ইংরেজীশিক্ষিত মনস্বী," যারা "ইংরেজ শাসনের
ভক্ত," তাঁদের সংস্কৃতি ও জীবনবেদ, সামন্ততন্ত্রী বা পুরাতনপন্থীদের সংস্কৃতির
যে সম্পূর্ণ বিপরীত এটা ইতিহাসের ছাত্র মাত্রই স্বীকার করবেন।

এইসব ইংরেজীশিক্ষিত মনস্বীর এই ধারণা ছিল যে পশ্চিমী বুর্জোয়া-গণতন্ত্রের
নব্যপন্থা'র মধ্যেই নিহীত রয়েছে মুক্তির বীজ। জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, সাহিত্যে,
জীবনের সর্বক্ষেত্রে, এই "সত্য" প্রতিষ্ঠার জন্য প্রগতিশীলদের সংগ্রাম করতে
হয়েছে। অথচ রবীন্দ্রবাবুরা এসব সংগ্রামের কোন তাৎপর্য স্বীকার তো করেন
নি বটেই, অন্যদিকে ঘোষণা করেছেন যে এরা সামাজিক, রাজনৈতিক ও
দার্শনিক দিক থেকে শুধু প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকাই নিয়েছেন অদ্ভুত যুক্তিজাল
বিস্তার করে, ইচ্ছামত অংশ উদ্ধৃত করে, রবীন্দ্রবাবুরা দেখাবার চেষ্টা করেছেন
যে রামমোহন একজন দ্বিতীয় মীরজাফর ( মার্কসবাদী, পৃ ১৬৪ ) ; রবীন্দ্রনাথ

1. "গণরাষ্ট্রের একনায়কত্ব",—মাও সে-তুং মার্কসবাদী ৫ম সংকলন।



প্রধানত প্রতিক্রিয়াশীল, কোন কোন ব্যাপারে গান্ধীজীর চাইতেও বেশী (পৃঃ ১৫০) ; রবীন্দ্রনাথ 'স্বদেশ প্রেমের', 'জাতীয়তা'র উদ্‌গাতা মোটেই নন, "বৃটিশ কমনওয়েলথের মধ্যে আজ ভারত যে ভাবে আবদ্ধ আছে এই বন্ধনই রবীন্দ্রনাথের কাছে স্বাধীনতা ; সুতরাং নেহরুর রাজনৈতিক দীক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথ" ( পৃ ১৪৭ ) ; বঙ্কিম-বিবেকানন্দ তো আমাদের গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির হত্যাকারী।

প্রাক-সোভিয়েট যুগে, বিদেশী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে একমাত্র পশ্চিমী ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিই ছিল প্রগতিশীল। ভারতের ইংরেজী শিক্ষিত মনস্বীদের তাই সে যুগে যদি পশ্চিমী রাষ্ট্রের কাছ থেকে শিক্ষা নেবার ইচ্ছা থেকে থাকে, ব্রিটিশ পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রে থেকে থাকে অগাধ বিশ্বাস, তবে তা যত অসম্পূর্ণই হোক না কেন, অসম্ভব নয় একেবারে। চীনের ইতিহাসের নব্যপন্থীদের মতাদর্শ আলোচনা করতে গিয়ে কমরেড মাও সে-তুঙ'ও তাই বলেছেন। অথচ "সমাজতান্ত্রিক জীবনাদর্শ" গ্রহণ করলেন না কেন, তাঁদের মতাদর্শে রিভাইভালিজমের চিহ্ন রইল কেন, ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের কথা এদের মতাদর্শে নেই কেন, এ সবের অজুহাতে রবীন্দ্রবাবুরা রামমোহন-বিবেকানন্দ সবাইকে প্রতিক্রিয়ার ধ্বজাধারী বলে চিত্রিত করেছেন ; উপদেশ দিয়েছেন তাঁদের ইতিহাসের ডাষ্টবিনে নিক্ষেপ করতে।

এটা অবশ্য ঠিক যে ভারতবর্ষের মুক্তি আন্দোলনকে সার্থকতার পথে নিয়ে যেতে হলে, অসমাপ্ত গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে সফল করতে হলে আজ মার্কসবাদ-লেনিনবাদের হাতিয়ার নিয়ে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। মার্কস্‌বাদী ডায়ালেকটিক্‌সের সাহায্যে আজ আমরা ভারতীয় সমাজের বিকাশ কোন পথে হবে, জাতীয়সত্তা পুনঃপ্রতিষ্ঠার পথ কি, এসব সম্পর্কে নির্ভুল সিদ্ধান্ত করতে পেরেছি। আজ তাই আমাদের পূর্বপুরুষদের চিন্তাধারার গুরুতর ত্রুটিগুলি সম্পর্কে আমরা সচেতন হয়েছি। মার্কসবাদী তত্ত্বে আরও ভাল করে আমরা বুঝতে শিখেছি যে রুশ বিপ্লবের পর পরিবর্তিত আন্তর্জাতিক অবস্থায়, "বুর্জোয়া গণতন্ত্র" আর আমাদের আদর্শ হতে পারে না ; এখন 'পিপলস রিপাবলিক' বা 'জনসাধারণের গণতন্ত্র'টাই বাস্তব, ঐতিহাসিক আদর্শ। অন্যান্য দেশে 'বুর্জোয়া সাধারণতন্ত্র' প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, কিন্তু ঔপনিবেশিক দেশে সোভিয়েট বিপ্লবের পর, "জনগণের গণতন্ত্র"ই কায়েম করতে হবে এটাই মার্কসবাদের শিক্ষা।

আমাদের পূর্বপুরুষেরা 'অন্য পথ' 'অন্য আদর্শ', নিয়েছিলেন ; তাই তাঁরা সফল হন নি। বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের, পশ্চিমী বুর্জোয়া সভ্যতার দেউলিয়াপনা আজ প্রমাণিত হয়ে গেছে। আজ তাই প্রলেটারিয়ান জীবনাদর্শ দিয়ে, বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদকে পরাস্ত করে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। এ সবই সত্য। কিন্তু রবীন্দ্রবাবুদের বক্তব্য শুধু এটুকু নয়।

প্রলেটারিয়ান আন্তর্জাতিকতাবাদের নামে, মার্কসবাদের নামে, তাঁরা নিয়েছেন পুরনো ঐতিহ্য যা কিছু সব বর্জন করার পথ,—বিশেষ ধরনের বাস্তব অবস্থায়, ভারতের 'মনস্বী'রা যে 'জীবনাদর্শ' গ্রহণ করেছিলেন সে সব এমনকি সমস্ত রকমের "জাতীয়তা" ও "স্বদেশপ্রেম" বর্জন করবার পথ। যে রামমোহন সর্বভারতীয় জাতীয়তার উদ্গাতা, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে, "জাতীয়চেতনা" বিকাশে যাঁর অসামান্য দান, তাঁকে রবীন্দ্রবাবুরা বিশ্বাসঘাতকের কোঠায় স্থান দিয়েছেন। যে বিবেকানন্দের দৌলতে একটা বিশেষ যুগে ভারতের অগণিত পেটিবুর্জোয়া আত্মসম্বিৎ ফিরে পেল, দুর্জয় কর্মোন্মাদনা ও দেশসেবা হচ্ছে যাঁর 'বাস্তব বেদান্তে'র (practical vedanta) মূল কথা তাঁকে রবীন্দ্রবাবুরা সাম্প্রদায়িক, দাস মনোভাব সম্পন্ন, সাম্রাজ্যবাদের তাঁবেদার বলে চিত্রিত করেছেন। যে রবীন্দ্রনাথের জন্যে ভারতবর্ষ বহির্বিশ্বে পরিচিত, যাঁর প্রভাব এখনও পেটিবুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের উপর প্রচণ্ড—কবিতায়, গানে, প্রবন্ধে, যিনি একটা বিশেষ যুগে, স্বদেশবাসীর প্রাণে অভয়মন্ত্র দিয়েছেন, তাঁকে রবীন্দ্রবাবুরা বড় বুর্জোয়াদের প্রতিনিধি, নেহরুর দীক্ষাগুরু বলে নাকচ করেছেন। ইতিহাসের এ মূল্যবোধ—অতীতের প্রতি এমন ঘৃণা, জাতীয় সন্ত্রাসবাদীদেরই সাজে, মার্কসবাদীদের নয়।

লেনিন প্রলেটারিয়ান সংস্কৃতির স্বরূপ বোঝাতে গিয়ে অতীতের সঙ্গে তার সম্পর্ক কেমন সে প্রশ্ন আলোচনা করেছিলেন, তিনি বলেছিলেন, "Marxism won its world-historic significance as the idology of the revolutionary proletariat, because it did not reject out and out the *most valuable achievements of the bourgeois epoch*, but on the contrary *made its own and worked over anew* all that was of value in the more than two thousand years of development of human thought. (1)

কিন্তু মার্কসবাদের নামে রবীন্দ্রবাবুরা ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির বিকাশধারায়, বুর্জোয়া চিন্তানায়কদের মতাদর্শে, কোনও গ্রহণযোগ্য, প্রগতিশীল জিনিস খুঁজে পান নি ; বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের নামে,

1. "Draft Resolution on proletarian culture", 1920 - Lenin



"the valuable achievements of the bourgeois epoch", সবটুকু বর্জন করার রাস্তা নিয়েছেন ?

ডিমিট্রভ বলেছিলেন, "We, communists are irreconcilable opponents, on principle, of bourgeois nationalism of every variety. But *we are not supporters of national nihilism*, and should never act as such. The task of educating the workers and all toilers in the spirit of proletarian internationalism, is one of the fundamental task of every Communist Party. But whoever thinks that this permits or even compels him to sneer at all national sentiments of the broad masses, is far from genuine Bolshevism, and has understood nothing of the teaching of Lenin & Stalin on the national question." (1)

অথচ রবীন্দ্রবাবুরা মার্কসবাদের নামে বিরাট পেটিবুর্জোয়া জনতার national sentementকে উপহাস করেছেন। রবীন্দ্রভক্তদের মার্কসবাদী প্রগতি শিবিরে আনবার চেষ্টা না করে তাঁদের শত্রু শিবিরেই ঠেলে দিচ্ছেন।

আজকের দিনের গণতান্ত্রিক প্রগতি শিবিরের যোদ্ধাদের কাজ কি ? আজকের দিনের কাজ হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, সামন্ততন্ত্র-বিরোধী বিরাট যুক্তফ্রণ্ট গড়ে তোলা, বড়বুর্জোয়াদের মুখোস খুলে ধরা এবং নয়া গণতান্ত্রিক সমাজ গড়বার পথে পা দেওয়া।

এই বাস্তব অবস্থায় বড় বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম করতে হবে এতো স্বতঃসিদ্ধ। তাঁরা যে 'জাতির' নামে-'দেশের' নামে, 'জাতীয়তাবাদী' সেজে জনসাধারণের রক্ত চুষে নিচ্ছে, প্রতিক্রিয়াকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে সাম্রাজ্যবাদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধশিবিরে গিয়ে পুরোপুরি যোগ দিয়েছে তাদের এই বিশ্বাসঘাতকতার স্বরূপ খুলে ধরতে হবে। জনসাধারণকে একথা বোঝাতে হবে যে আজকের দিনে নির্বিত্ত শ্রেণীর নেতৃত্বে যে শ্রেণীসংগ্রাম চলেছে স্বাধীন ও সুখী জাতীয়জীবন গড়ে তোলবার সেটাই একমাত্র পথ। নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমেই যে 'জাতি' বাঁচতে পারে, জাতীয়জীবনের শ্রীবৃদ্ধি ও বিকাশ যে সেপথেই একমাত্র সম্ভব, নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে জনসাধারণ ক্রমশঃ এ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠবে।

1. The working class againist Fascism, Part II pp 46-47-Dimitrov

প্রলেটারিয়ান আন্তর্জাতিকতাবাদের নামে জাতীয়-সাংস্কৃতিক জীবনের অতীত ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ সব অধ্যায়কে প্রতিক্রিয়াশীলতার অপবাদে বাদ দিয়েছেন। সমাজসংস্কার ও সংস্কৃতিক্ষেত্রে স্বাধীনতার জন্যে যে সমস্ত সংগ্রাম হয়েছে, তাদের তাৎপর্য তাঁরা একেবারেই স্বীকার করেন নি। সামন্ততান্ত্রিক অচলায়তন সমাজের মতাদর্শের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক মতাদর্শ কিভাবে গড়ে উঠল—ভারতীয় পরাধীন সমাজে (oppressed nation) কিভাবে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা জাগল—এই আকাঙ্ক্ষা কিভাবে বিকশিত হয়ে উঠল নানাভাবে, রবীন্দ্রবাবুরা এসব বিশ্লেষণের ধার ধারেন না। 'জাতীয় চেতনার' বিকাশ তাঁদের মতে বোধ হয় স্বয়ম্ভূ, তার ইতিহাস নেই—ক্রমপরিণতি নেই—বিভিন্ন ধারা নেই; শুধুই ১৮৫৫-৫৯'এর রক্তাক্ত গণবিদ্রোহের রাস্তায় এর জন্ম। তার আগে বা পরে এর আর কোন ইতিহাস স্বীকার করা চলে না।

ইতিহাসের এই উপলব্ধি রবীন্দ্রবাবুদের হয়েছে এজন্যে যে তাঁদের রাজনৈতিক বক্তব্য হল "ভারতের বুর্জোয়ারা বরাবরই প্রতিবিপ্লবী ভূমিকা নিয়ে এসেছে।" শীতাংশুবাবু তো কমিনফর্ম বেরুবার পরও ঘোষণা করেছেন, "আমাদের দেশের বুর্জোয়ারা চিরকাল ইংরেজের সঙ্গে রফা করে বেড়ে উঠেছে।" "কিন্তু একথা মনে করলে খুব ভুল হবে যে এই ভারতীয় ঔপনিবেশিক বুর্জোয়ারা কোনদিন অন্যান্য স্বাধীন দেশের বুর্জোয়াদের মত সত্যিই প্রথম দিকে প্রগতিশীল ছিল।"

অতএব, শীতাংশুবাবু রবীন্দ্রবাবুর সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলেছেন, "এই বুর্জোয়াদেরই মুখপাত্রদের (অর্থাৎ বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ) সৃষ্ট সাহিত্য ব্রিটিশবিরোধী অর্থে প্রগতিশীল হতে পারে না; এবং সেইজন্যেই কোন অর্থেই হতে পারে না।" কিন্তু আসল প্রশ্ন হল তাই। রবীন্দ্রবাবুদের গোড়ার কথাটাই হল যে ভারতবর্ষের বুর্জোয়ারা চিরকাল ইংরাজের সঙ্গে রফা করে বেড়ে উঠেছে। কথাটা ঠিক হলে রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য মনস্বীদের ঐতিহ্য সম্পর্কে রবীন্দ্রবাবুদের সিদ্ধান্ত ভুল হতে পারে না। কিন্তু রবীন্দ্রবাবুদের গোড়ায় গলদ। "ভারতীয় বুর্জোয়ারা চিরকাল ইংরেজদের সঙ্গে রফা করে বেড়ে উঠেছে", এটা মার্কসবাদের শিক্ষা নয়, কাজেই রবীন্দ্র-শীতাংশুবাবুদের সিদ্ধান্ত ভুল এবং মার্কসবাদবিরোধী।

১৯০৮ সালে লেনিন ঘোষণা করেছিলেন যে সারা এশিয়া জুড়ে এক বিরাট গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে উঠছে এবং "there the Bourgeoisie is still siding with the people against reaction" (1) ১৯২৫ সালে ষ্টালিন

1. **Backward Europe and Progressive Asia – Lenin**



আন্তর্জাতিকতা দিয়ে "নতুন 'স্বদেশপ্রেমে'"-রই তাঁরা আবাহন করবেন। প্রলেটারিয়ান মতাদর্শ দিয়ে, অতীতের কদর্য কুৎসিৎ দিক্ সম্পূর্ণ বর্জন করে তার সুন্দর শোভন, গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল দিকটুকু গ্রহণ করে, নবজীবনের পথে এগিয়ে যাবেন।

আজকের দিনে বড়-বুর্জোয়াদের বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে লড়তে গেলে মার্কসবাদীদের, বর্তমান অধ্যায়ের সংগ্রামের সাথে নিজেদের গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের—দেশের গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল অতীতের সংযোগসাধন করতেই হবে। তা না হলে জাতির জীবনে যা কিছু মহৎ সবই বড়-বুর্জোয়ারা কাজে লাগাবে নিজেদের প্রতিক্রিয়াশীল নীতির সমর্থনে, জনতাকে বোকা বানাবার জন্যে। আদর্শগত সংগ্রামে সাফল্য লাভ করতে হলে মার্কসবাদীদের তাই দেখাতে হবে যে তারাই দেশের প্রগতিশীল, সংগ্রামী ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী, বড়-বুর্জোয়ারা নয়।

জওহরলাল রবীন্দ্রনাথকে গুরু বলে মানবেন, গোলওয়ালকার বিবেকানন্দের ভক্ত সাজবেন এতো স্বাভাবিক। শ্রেণীস্বার্থের খাতিরে এদের এ পথ নিতেই হবে। রবীন্দ্রনাথ-বিবেকানন্দের ঐতিহ্যকে প্রতিক্রিয়ার শক্তি ব্যবহার করবে নিজেদের বনিয়াদ শক্ত করবার জন্যে এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। জনতার উপর প্রভাব বজায় রাখবার জন্যে, পেটি-বুর্জোয়াদের মোহ দীর্ঘস্থায়ী করবার জন্যে প্রতিক্রিয়া এ কৌশল অবলম্বন করে নিজেদের প্রগতিবিরোধী মতাদর্শের জৌলুষ বাড়াবে, এতো তাদের শ্রেণী-সচেতনতারই পরিচয়। কিন্তু রবীন্দ্রবাবুরা বড়-বুর্জোয়াদের মুখোস খুলে ধরবার জন্যে তাদের প্রতিক্রিয়াশীল শাসন সম্পর্কে জনতাকে মোহমুক্ত করবার জন্যে কোন্ পথ ধরেছেন? তাঁরা ধরেছেন, আসলে আত্মসমর্পনের পথ। তাঁদের আওয়াজ হল, "রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ—এঁদের সব প্রগতিশিবির থেকে দূর কর। এঁরা প্রগতি যোদ্ধাদের অস্পৃশ্য।" এতে ফল হয়েছে এই যে দেশী প্রতিক্রিয়ার শক্তিগুলি রবীন্দ্রনাথদের দুর্বল জায়গাগুলি নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগিয়েছে, এবং তাদের স্বেচ্ছাচারী শাসনের পেছনে রবীন্দ্রনাথদের নাম করে নৈতিক সমর্থন জুটিয়ে এসেছে। রবীন্দ্রনাথদের ঐতিহ্যের তারাই উত্তরসাধক, রবীন্দ্রনাথ থাকলে যে তাদেরই সমর্থন করতেন, এরকম একটা আবহাওয়া সৃষ্টি করেছে।

রবীন্দ্রবাবুদের নীতির দৌলতে বাস্তবে প্রতিক্রিয়ার সামাজিক বনিয়াদ

আরও শক্ত হয়েছে। কারণ রবীন্দ্রবাবুদের সন্ত্রাসবাদী নীতির ফলে রামমোহন-বিবেকানন্দের মতাদর্শের ত্রুটি সম্পর্কে জনসাধারণ সচেতন হয়ে উঠছে না, অগনিত বাঙ্গালী পেটিবুর্জোয়া যারা সঙ্গতভাবেই রবীন্দ্রভক্ত, তাদের জয় করা যাচ্ছে না। বাস্তবে ফল দাঁড়িয়েছে এই যে প্রতিক্রিয়ার শক্তিগুলি রামমোহন-রবীন্দ্রনাথের নাম নিয়ে জনসাধারণকে নিজেদের শিবিরে ধরে রাখছে আর "প্রগতিপন্থীরা','মার্কসবাদীরা' জাতীয় ঐতিহ্যের কুৎসা-রটনাকারী" একথা বলে তাদের জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে। তাই আজ মার্কসবাদীদের উপর শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে পেটি-বুর্জোয়াদের নিয়ে সংযুক্ত ফ্রণ্ট গড়ে তোলার যে দায়িত্ব এসে পড়েছে, সে দায়িত্ব পালন করা যাচ্ছে না; রবীন্দ্রবাবুরা বেশ কৃতিত্বের সঙ্গে প্রগতির শিবিরকে ছত্রখান করে দিচ্ছেন।

অথচ মতাদর্শগত সংগ্রামের মার্কসবাদী কায়দা সম্পর্কে ভুল হবার কথা নয়। ডিমিট্রভ "ফ্যাশিষ্টদের বিরুদ্ধে মতাদর্শগত সংগ্রাম" নিয়ে আলোচনা করবার সময়, এ সম্পর্কে পরিষ্কার নীতি ঘোষণা করে গেছেন বহুদিন আগে। তার উপদেশ ছিল, অতীতের সবটা বাতিল করো না, জাতির যারা বিরাট মনস্বী তাঁদের প্রতিক্রিয়ার হাতে ছেড়ে দিও না। সেটা মার্কসবাদ-সম্মত নয়। (1)

আজ যখন সাম্রাজ্যবাদ ও তার দেশী এজেন্টরা ভারতবর্ষের "নয়া ইতিহাস", "দর্শনের ইতিহাস" লিখছে, প্রত্যেক দেশের ইতিহাস ঘেঁটে একথাই প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করছে যে তারাই দেশের গৌরবময় অতীতের উত্তরাধিকারী এবং প্রগতি যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি করছে একথা বলে যে তাঁরাই দেশের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য সব কিছুরই নিন্দাকারী, তাঁরাই বিজাতীয় মনোভাবসম্পন্ন, তখন রবীন্দ্রবাবুরা কি করেছেন? তাঁরা একথা প্রমাণ করতে পারেন নি যে প্রগতি যোদ্ধারাই দেশকে বাঁচাচ্ছে, দেশের নতুন সংস্কৃতি সৃষ্টি করছে—গৌরবময় অতীতকে আরও অগ্রসর করে নিয়ে যাচ্ছে মহত্তর সম্ভাবনার দিকে। জনসাধারণকে একথা তাঁরা বোঝাতে পারেন নি যে প্রগতি যোদ্ধাদের 'আন্তর্জাতিকতা'র সাথে 'স্বদেশপ্রেমে'র কোন বিরোধ নেই; বরং প্রলেটারিয়ান আন্তর্জাতিকতার মাধ্যমেই এই স্বদেশপ্রেম আরও মহনীয় হয়ে উঠছে। রবীন্দ্রবাবুরা কি দেখাতে পেরেছেন রবীন্দ্রনাথের যা কিছু আদর্শ সবই প্রতিক্রিয়ার হাতে পড়ে কলঙ্কিত হচ্ছে; সে সব আদর্শ প্রগতির সৈনিকদের হাতেই নিরাপদ এবং তাঁরাই সে আদর্শকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে? রবীন্দ্রবাবুরা কি বলতে পেরেছেন,

1. Working class against Fascisim—Dimitrov, pp 49.



"আমরা রামমোহন-বিবেকানন্দের-রবীন্দ্রনাথের অসম্পূর্ণতার কথা জানি। কিন্তু শাসকশ্রেণী যে তাদের নিজেদের শিবিরের পার্টিসান বলে দাবি করে সেটা মিথ্যা কথা। রামমোহন-বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথ যে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে, নারীপুরুষ সমানাধিকারের জন্যে, জ্ঞানে, কর্মে সমাজকে নতুন করে গড়বার চেষ্টা করেছেন—আমরাই তাদের সেই প্রগতিশীল ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী। আমরাই রবীন্দ্রনাথের জীবনাদর্শকে—তাঁর মানবতা, ব্যক্তিস্বাধীনতার জয়গান, আশাবাদ, আন্তর্জাতিকতা, সব কিছুকেই নতুন অবস্থায় নতুন রূপ দিচ্ছি। আমরাই এ সব মনস্বীর গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল ভাবসম্পদকে রক্ষা করছি, প্রতিক্রিয়ার হাত থেকে; আমরাই তাদের ঐতিহ্যকে কলঙ্কিত হতে দিচ্ছি না শাসকশ্রেণীর কলুষ-হস্তস্পর্শে।" কৈ? জার্মান কমিউনিষ্টরা যেমন আওয়াজ তুলেছিল, "গ্যেটে আমাদের, গ্যেটেকে আমরা ফ্যাশিষ্টদের হাতে ছেড়ে দিতে পারিনা", রবীন্দ্রবাবুরা সেরকম আওয়াজ তুলতে তো পারেন নি, "রবীন্দ্রনাথরা আমাদের; নেহেরু, গোলওয়ালকারের হাতে এদের আমরা ছেড়ে দিতে পারি না।" তাঁরা বরং উল্টো আওয়াজ তুলেছেন, "প্রগতিশিবির থেকে রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্যদের দূর কর।"

আসল কথাটাই হল যে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদকে লড়বার মার্কসবাদী কৌশল রবীন্দ্রবাবুরা বর্জন করেছেন; তাঁরা ধরেছেন জাতীয় সন্ত্রাসবাদ—ট্রটস্কীবাদের পথ। ফল যা হবার তাই হয়েছে। মতাদর্শের সংগ্রামে প্রতিক্রিয়া জিতেছে, প্রগতিযোদ্ধারা হেরে গেছেন।

(৫) রবীন্দ্রবাবুরা মার্কসবাদ বর্জন করে ট্রটস্কীবাদের পাঁকে এমন আকণ্ঠ ডুবেছেন যে পেটিবুর্জোয়াদের ভূমিকা সম্পর্কেও তাঁরা মারাত্মক ভুল করেছেন। শীতাংশুবাবু তা পেটিবুর্জোয়াদের সম্পর্কে সাবধানধ্বনিই উচ্চারণ করেছেন। প্রগতি সাহিত্য শিবিরে থেকেও অনেকে মনে করেন যে ভারতের বর্তমান অবস্থায় অর্থাৎ নয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের যুগে, পেটিবুর্জোয়া শ্রেণী বুঝি 'মিত্রশ্রেণী'! শীতাংশুবাবুর মতে এই মার্কসবাদ-বিরোধী উপলব্ধি নিয়ে প্রগতি সাহিত্য শিবিরকে জোরদার করা যাবে না! শীতাংশুবাবু তাই বলেছেন, "আর একথাও মনে রাখা দরকার যে আজকে সাম্রাজ্যবাদকে খতম করার মানেই দেশীয় শোষকদেরও খতম করা। বিপ্লবকে সেই পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে একমাত্র শ্রমিকশ্রেণী; আর সকলেই তার নেতৃত্ব ভিন্ন নানান দ্বিধায় পেছপা হবে—বিশেষ করে পেটিবুর্জোয়ারা। পেটিবুর্জোয়ারা কিভাবে বিপ্লবকে বানচাল করে তার

দৃষ্টান্ত আজকের দিনে People's Democracy-গুলিতে অপ্রতুল নয়। সেখানে শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি থেকে এসব বিপ্লবভাঙ্গাদের বের করে দেওয়া হচ্ছে।"

আরও আছে। ট্রটস্কীবাদের আবর্তে পড়লে যে উদ্ধারের আশা নেই, শীতাংশুবাবুই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। শীতাংশুবাবুর বক্তব্য শুনুন: "যদি কোন 'সংস্কারবাদী' সাহিত্যিক বলেন যে আজকের দিনের বাস্তব অবস্থায়, নয়া গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি ও সাহিত্যসৃষ্টিই যখন ভারতবর্ষের প্রগতি সাহিত্যিক ও সংস্কৃতি কর্মীদের কাজ তখন প্রগতি সাহিত্যিক 'নির্বিত্ত শ্রেণীর নিয়ন্ত্রণাধীনে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রবিরোধী সংযুক্ত ফ্রন্টের' প্রবক্তা হবেন, এ ফ্রন্টের যাঁরা অংশীদার তাঁদের আশা আকাঙ্ক্ষা, দুঃখ বেদনা, তাঁদের নবজীবনের পথে অভিযান এসবকে তিনি ভাষা দেবেন, 'জনতা'কে করে তুলবেন সাহিত্যভাত; তবে শীতাংশুবাবু তাকে ধমক দেবেন, বলবেন, "সকল শ্রেণীর মুখপাত্র হবার চেষ্টা করা এবং সমাজবাদ না এলে সমাজবাদী চেতনা আসবে না এ যান্ত্রিকতার প্রশ্রয় দেওয়া তীব্র শ্রেণী সংগ্রামের যুগে বুর্জোয়া প্রচারের কাছে পরাস্ত হওয়ারই নামান্তর।"

অর্থাৎ শীতাংশুবাবুর রাজ নৈতিক বক্তব্য হল যে, (১) আজকে ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যবাদকে খতম করা মানেই দেশীয় শোষকদেরও খতম করা। সোজা কথায় ভারতের বিপ্লবী আন্দোলনের প্রকৃতি আজ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শুধু নয়, ধনতন্ত্র-বিরোধীও বটে। (২) কাজেই পেটিবুর্জোয়াদের সম্পর্কে সাবধান! তারা বিপ্লবভাঙ্গাদের দলে! (৩) "সকল শ্রেণীর মুখপাত্র হওয়া" প্রগতি সাহিত্যিকের আদর্শ হতে পারে না কেননা অন্য সব শ্রেণীই বিপ্লব শুধু ভাঙ্গে, বিপ্লব শ্রমিক শ্রেণীই করে!"

শীতাংশু বাবু কেমন স্বচ্ছন্দে ট্রটস্কীবাদী তত্ত্ব প্রচার করেছেন তাঁর এই রাজনৈতিক বক্তব্য থেকেই জলের মত সেটা প্রমাণ হচ্ছে। শীতাংশুবাবু ভারতের বিপ্লবী আন্দোলনের প্রকৃতি সম্পর্কে আন্তর্জাতিক সিদ্ধান্ত মেনে নেননি। তাই তিনি আজও ঘোষণা করতে পারেন যে "আজকে সাম্রাজ্যবাদকে খতম করা মানেই দেশী শোষকদেরও খতম করা।" অথচ আন্তর্জাতিক শিক্ষা, কমরেড মাওয়ের শিক্ষা হচ্ছে স্বতন্ত্র। চীনের বেলায় যেমন ভারতের বেলায়ও তেমনি নয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবে সাম্রাজ্যবাদ, জমিদার ও আমলাতান্ত্রিক পুঁজিপতি শ্রেণী, বড় শোষকদেরই



খতম করা হবে। বাকি থাকবে যে শোষকশ্রেণী সেই "জাতীয় বুর্জোয়াদের" বিপ্লবের প্রথম অধ্যায়ে অন্তত খতম করা হবে না।

কমরেড মাও সে-তুঙ তাঁর "নয়াগণতন্ত্রে" বহুদিন আগে বুঝিয়েছেন যে আধা-সামন্ততান্ত্রিক, আধা-ঔপনিবেশিক দেশে সামন্ততন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদকে খতম করাই মূল কাজ, সমাজতন্ত্র কায়েম করা, সাধারণভাবে সব শোষকদের খতম করা বিপ্লবী আন্দোলনের আশু লক্ষ্য নয়। সেইজন্যে কমরেড মাও তাঁর "দুই অধ্যায়ের বিপ্লব" তত্ত্ব বুঝিয়েছিলেন। শীতাংশুবাবুরা অবশ্য "এক অধ্যায়ের বিপ্লবে" আস্থাবান। কাজেই মাও-এর তত্ত্ব গ্রহণ না করে তাঁরা মার্কসবাদ-বিরোধী, যুগোশ্লাভ টিটো-গোষ্ঠীর অন্যতম নায়ক কার্দেলির "গণতান্ত্রিক বিপ্লব সমাজতন্ত্রের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত" এই ট্রটস্কীবাদী তত্ত্ব এখনও প্রচার করছেন। কার্দেলির "Interblending" তত্ত্ব ভারতের "জনগণের গণ-তন্ত্রের" স্বরূপ আলোচনায় "মার্কসবাদী" গ্রহণ করেছিল। (1) কার্দেলি বুঝিয়েছিল যে যুগোশ্লাভ গভর্নমেণ্ট শুধু যে সামন্ততন্ত্র ও একচেটিয়া পুঁজিকে খতম করেছিল তা নয়; সাধারণভাবে শোষকদের খতম করে, সরাসরি সমাজতন্ত্র গঠনে অগ্রসর হয়েছিল। "The Government could not restrict itself merely to liquidating the various feudal remnants and capitalist monopolies but had to adopt a clear course leading to a *general elimination* of capitalism and the construction of Socialism in Yugoslavia." (2)

কার্দেলির ও শীতাংশুবাবুদের তত্ত্ব শুনতে খুবই বিপ্লবী; সত্যিই তো "দেশীয় শোষকদেরও খতম করা" অর্থাৎ সাধারণভাবে ধনতন্ত্রের উচ্ছেদ, কুলাক শ্রেণীর উচ্ছেদ করে এগিয়ে যাওয়া, বিপ্লবী তত্ত্ব নয় কি? অথচ আন্তর্জাতিক মার্কসবাদী ১৯৪৮ সালের জুন মাসে যে প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল তাতে পরিষ্কার বলা হয়েছিল যে এ তত্ত্ব মার্কসবাদ-বিরোধী। আন্তর্জাতিক ঘোষণা করেছিল, "of late the leaders of the Communist Party of Yugoslavia, have, with perfect aplomb, declaiming a policy of liquidating the capitalist elements in Yugoslavia. In a letter to the Central Committee of the CPSU(B) dated April 13, Tito & Kardelj wrote that "the plenum of the Central Committee

1 ভারতে নয়াগণতন্ত্র—"মার্কসবাদী", দ্বিতীয় সংখ্যা পৃ ৫৪
2 Lessons of Yugoslav Resolution, E Kardelj, 'Communist.'

approved the measure proposed by the Political Bureau of the Central Committee to liquidate the remnants of Capitalism in in the country." In accordance with this line Kardelj, speaking in the Skupschina on April 25, declared, "In our country the days of the last remnats of the exploitation of man by man are numbered."

কার্দেলির কথা শুনতে সত্যই তো চমৎকার। কিন্তু আন্তর্জাতিক মার্কসবাদী ঘোষণা করেছিল, "In the conditions prevailing in Yugoslavia this position of the leaders of the Communist Party in regard to the liquidation of the capitalist elements, and hence the Kulaks as a class, cannot be qualified as other than adventurous and non-Marxist." (1)

অনুন্নত, কৃষিপ্রধান, সামন্ততান্ত্রিক দেশে সরাসরি "দেশী শোষকদের" উচ্ছেদ করা যে সম্ভব নয়, এ প্রশ্ন আলোচনা করে আন্তর্জাতিক ঘোষণা করেছিল, "The Information Bureau considers that since these latest decrees and declarations of the Yugoslav leadership are demagogic and impracticable in the present conditions, they cannot but compromise the banner of Socialist construction in Yugoslavia.

That is why the Information Bureau considers such adventurist tactics undignified manoeuvre and an impermissible political game." (2)

অথচ শীতাংশুবাবুরা সমর্থনের অযোগ্য এই "রাজনৈতিক খেলা" (Political Game) এখনও খেলছেন। এখনও 'পরিচয়'-এর পৃষ্ঠায় নির্বিবাদে কার্দেলির তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে যাচ্ছেন।

এ রাজনৈতিক খেলারই অন্যদিকে হচ্ছে পেটিবুর্জোয়াদের বিপ্লব-ভাঙ্গাবার দলে বলে গাল দেওয়া। শীতাংশুবাবুরা পেটিবুর্জোয়াদের সম্পর্কে যে তথ্য আহরণ করেছেন যে তারা People's Democracy গুলিতে বিপ্লবকে বানচাল করে দিয়েছে, সে সম্পর্কে আমাদের কোন তথ্য তিনি দেন নি। কিন্তু একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে পেটিবুর্জোয়াদের সম্পর্কে শীতাংশুবাবুরা যে তত্ত্ব খাড়া করেছেন, মার্কসবাদের শিক্ষার সাথে তার কোন মিলই নেই। ষ্টালিন শিক্ষা

1. Cominform Resolution on Yugoslavia—June 1948
2. ঐ



দিয়েছিলেন (1) যে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে ঔপনিবেশিক দেশে পেটি-বুর্জোয়ারা বিপ্লবীফ্রণ্টের অংশীদার। মাও'এর শিক্ষাও তাই। পেটিবুর্জোয়ারা যে গণতান্ত্রিক বিপ্লবে নেতৃত্ব দিতে পারে না, তাদের নেতৃত্বে যে বিপ্লব সফল হতে পারে না এ তত্ত্ব মার্কসবাদ-সম্মত। কিন্তু পেটিবুর্জোয়ারা 'বিপ্লব-ভাঙ্গা' এ তত্ত্ব একান্তভাবেই ট্রটস্কীবাদ-সম্মত। ভারতবর্ষে যে গণরাষ্ট্রিক একনায়কত্ব স্থাপন করতে হবে সেটা হবে "সমস্ত বিপ্লবী শ্রেণীর একনায়কত্ব" (মাও) (2), যার ভেতর পেটি-বুর্জোয়ারাও থাকবে। "নির্বিত্ত শ্রেণীর নিয়ন্ত্রণাধীন সংযুক্ত ফ্রণ্টে' পেটিবুর্জোয়ারা ঘনিষ্ট সহযোগী—মিত্রশ্রেণী, এটাই চীনের বিপ্লবের শিক্ষা। কিন্তু আগেই বলা হয়েছে শীতাংশুবাবুরা চীনের অভিজ্ঞতা থেকে, আন্তর্জাতিক মার্কসবাদের কাছ থেকে কিছু শেখবার চেষ্টা করেন নি। ট্রটস্কীবাদী মন্ত্রে তাঁরা দীক্ষা নিয়েছেন কাজেই তাঁদের উপলব্ধি তো মার্কসবাদ-বিরোধী হবেই।

ট্রট্স্কীবাদের ভূত ঘাড়ে চেপেছে বলেই শীতাংশুবাবুরা বলতে পারেন, অন্য সব শ্রেণীরাই বিপ্লব-ভাঙ্গাদের দলে—"বিপ্লব শ্রমিকশ্রেণীই করে।" ট্রট্স্কীবাদের মতেই শ্রমিকশ্রেণী একাই বিপ্লব করে। অভিমন্যুর মত শ্রমিক শ্রেণী চারদিকে শত্রুপরিবেষ্টিত। নিঃসঙ্গ, নির্বান্ধব, একক শ্রমিকশ্রেণী অন্য সব শ্রেণীর প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যাচ্ছে—বিবপ্লভাঙ্গাদের পরাস্ত করে বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। মার্কসবাদের শিক্ষা কিন্তু স্বতন্ত্র। মার্কসবাদের মতে শ্রমিকশ্রেণী একা বিপ্লব করে না, শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে অগণিত জনতা বিপ্লব করে—মার্কসবাদের এই শিক্ষা (3)। সব উপনিবেশিক সামন্ততান্ত্রিক দেশের বেলায় যেমন ভারতের বেলায়ও তেমনি, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লবে শ্রমিক-শ্রেণী বন্ধুদের সাহায্য নিয়েই অগ্রসর হবে। শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে কৃষক, পেটি-বুর্জোয়া মাঝারি জাতীয় বুর্জোয়ারা মিলিত হবে লড়াইয়ের ময়দানে, বিপ্লবকে সফল করবার জন্যে। তা ছাড়া, ইওরোপ ও আমেরিকার গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল শান্তির শিবিরের যোদ্ধারাও আমাদের বন্ধু হিসেবে রয়েছে। এ সব হিসেব না করে, "বিপ্লব শ্রমিকশ্রেণীই করে" বল্লে, গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল শক্তিকে ছোট করে দেখাই যে শুধু হয় তা' নয়, মার্কসবাদ বর্জন করাও হয়।

"বিপ্লব শ্রমিকশ্রেণীই করে", একথা শীতাংশুবাবু লিখেছেন এ জন্যে যে তাঁর চেতনায় এখনও একথাটা রয়েছে যে শ্রমিকশ্রেণী ছাড়া আর সব শ্রেণীই বিপ্লব

1. Toilers of the East—Stalin
2. New Democracy—Mao Tse-Tung
3. Marxism and the National and the Colonial question, pp

ভাঙ্গাদের দলে। অথচ ভারতবর্ষে যে "গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব" কায়েম করতে হবে তাতে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে কৃষকসম্প্রদায়, পেটিবুর্জোয়া এবং জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী সংঘবদ্ধ হবে। এবং এসব শ্রেণী সম্মিলিতভাবে বিপ্লবকে সফল করে তুলবে। "শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে বিপ্লব সংঘটিত হবে" এই সঠিক মার্কসবাদী সূত্র থেকে "বিপ্লব শ্রমিকশ্রেণীই করে"—এই ট্রট্স্কীবাদী সিদ্ধান্তে শীতাংশুবাবু হাজির হয়েছেন, এতে তাঁর তর্ককুশলতাও প্রমাণ হয় নি।

আজকের দিনে প্রত্যেক মার্কসবাদীর কর্তব্য হচ্ছে আন্তর্জাতিকের ভিত্তিতে ও চীনের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রবাবুদের "রাজনীতি"কে বিচার করে দেখা এবং যদি তাঁদের বক্তব্যের ভেতর মার্কসবাদ-বিরোধী, ট্রট্স্কীবাদী তত্ত্ব কিছু থাকে, তবে বিষের মত তা' বর্জন করা। কারণ ট্রট্স্কীবাদকে নির্মূল করতে না পারলে শ্রমিকশ্রেণীর অধিনায়কত্বে সংযুক্ত ফ্রণ্ট গড়ে তোলা যাবে না,—না রাজনীতিতে, না সাহিত্যে। আজ তাই মার্কসবাদ লেনিনবাদের শিক্ষা গ্রহণ করে, আন্তর্জাতিকের অমূল্য উপদেশ শিরোধার্য করে, আমাদের অগ্রসর হতে হবে।

সে জন্যে রবীন্দ্রবাবুর মার্কসবাদ-বিরোধী সাহিত্যিক থিসিস বর্জন করাটাই প্রথম কাজ। তারপর মার্কসবাদী তত্ত্ব আয়ত্ত করে, ষ্টালিন-মাও'এর শিক্ষা গ্রহণ করে প্রগতি সাহিত্যের শিবিরকে জোরদার করে তোলাটা দ্বিতীয় কাজ।

প্রগতি সাহিত্যিকদের আজ দু'ফ্রণ্টে লড়াই চালাতে হবে, একদিকে দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদ অন্যদিকে বামপন্থী অতিবিপ্লববাদ এবং বর্তমানে দ্বিতীয়টাই বেশী জরুরী। রবীন্দ্রবাবুদের হাতে পড়ে মার্কসবাদ প্রগতি সাহিত্যিকদের ও জনসাধারণের মাঝখানে বিচ্ছেদের প্রাচীর তুলে ধরেছিল। কিন্তু মার্কসবাদী তত্ত্ব তো গুরুর মন্ত্র নয় যে শুধু ভক্তসম্প্রদায়ের জন্যে, এক বিশেষ গোষ্ঠীর জন্যে তা থাকবে। আজ আবার মার্কসবাদকে আমাদের নিয়ে যেতে হবে জনসাধারণের মধ্যে—তাদের উদ্বুদ্ধ করে তুলতে হবে এই নতুন জীবনবেদ দিয়ে। তবেই তারা গণতান্ত্রিক লড়াইয়ে সামিল হবে। রবীন্দ্রবাবুদের হাতে পড়ে মার্কসবাদের যা দশা হয়েছে তাতে আমরা পুরনো ভুল সম্পর্কে সচেতন হয়েছি। শত্রুদের সাথে লড়াই আমরা করব, কিন্তু ভবিষ্যতে আর আমরা মিত্রদের, সহযোগীদের, শত্রুর কোঠায় ফেলবার ট্রট্স্কীপন্থী নীতি চালু হতে দেব না। আমাদের মনে রাখতে হবে যে আজও অনেক লেখক, শিল্পী, বৈজ্ঞানিক, শিক্ষাব্রতী বুর্জোয়া জীবনাদর্শের পাঁকে আটকা পড়ে রয়েছেন। এঁরা অনেকেই



প্রতিক্রিয়াশীল ভাবধারা প্রচার করছেন। কিন্তু প্রগতিকর্মীদের এটা মনে রাখতে হবে যে এঁদের মধ্যে অধিকাংশ সচেতনভাবে প্রতিক্রিয়ার শিবিরের পার্টিসান নন। এঁদের জয় করাটা প্রগতিকর্মীদের কর্তব্য। এবং সঠিক নীতি গ্রহণ করলে এদের জয় করা অসম্ভব নয়। শ্রমিক শ্রেণীর মতাদর্শ এতই বৈজ্ঞানিক, বৈপ্লবিক অভিজ্ঞতায় এতই সমৃদ্ধ, যে এ মতাদর্শ ঠিকমত জনসাধারণের মধ্যে নিয়ে যেতে পারলে, নিজেদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই, তাদের মোহভঙ্গ হবে,—তারা সন্ধান পাবে নতুন সম্ভাবনার, আনন্দোজ্জ্বল ভবিষ্যতের।

ভারতবর্ষে প্রগতি সাহিত্যের প্রকৃতি কি হবে, কুও মো জো'র "চীনের সাহিত্যে ও শিল্পে সংযুক্ত ফ্রণ্ট" পড়বার পর সে বিষয়ে সন্দেহ থাকবার আজ আর কথা নয়। বর্তমান স্তরে, ভারতবর্ষের বিপ্লব প্রকৃতিগতভাবে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব নয়। এটা এমন কি, দু'নম্বর "মার্কসবাদী" যে তত্ত্ব খাড়া করেছিল যে ভারতের নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত (interweaving, inter-lacing, growing over), সে তত্ত্বও আজ বাতিল হয়ে গেছে। আন্তর্জাতিকের শিক্ষা ও চীনের অভিজ্ঞতা থেকে আজ আমরা জেনেছি যে ভারতের বিপ্লব ও "শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে জনগণের সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্র-বিরোধী বিপ্লব", এবং এ বিপ্লব সম্পন্ন হলে পর, তবেই সমাজতন্ত্র গঠনের প্রশ্ন উঠবে তার আগে নয়।

কাজেই একথা পরিষ্কার যে আমাদের সংস্কৃতি ও সাহিত্য নতুন প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি ও সাহিত্যে পরিণত হবে, যার মর্মবাণী হবে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্র-বিরোধী। এ নতুন সংস্কৃতি ও সাহিত্য হবে বৈজ্ঞানিক ভাবধারায় সমৃদ্ধ; জাতির আশা আকাঙ্খাকে এ রূপ দেবে, জনতার সৃজনীশীল প্রতিভার প্রশংসা থাকবে তাতে, আর জনতার জীবনের বিচিত্রধারা শিল্পকর্ম—সমন্বিতরূপ পাবে এর মাধ্যমে। এ নতুন সংস্কৃতি ও সাহিত্য শুধু উপরতলার মানুষদের অবসর বিনোদনের উপায় হবে না; অন্যদিকে এ সংস্কৃতি ও সাহিত্য হবে 'জনগণের সম্পত্তি'।

কাজেই দু'টো জিনিস পরিষ্কার। ভারতে প্রগতিসাহিত্য আপাতত শ্রমিক শ্রেণীর প্রলেটারিয়ান সাহিত্য হয়ে উঠছে না। আবার এ সাহিত্য পুরনো গণতন্ত্রের অচল সাহিত্যও থাকছে না। এ সাহিত্য হবে নয়াগণতন্ত্রের নতুন প্রগতিশীল সাহিত্য।

রাজনীতিতে যেমন, তেমনি সাহিত্য ও শিল্পের যুক্তফ্রন্ট শ্রমিক শ্রেণীর নিয়ন্ত্রণাধীন হবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এই যুক্তফ্রণ্টে শ্রমিক শ্রেণী ছাড়াও কৃষক সমাজ, পেটবুর্জোয়া, 'জাতীয়' বুর্জোয়া শ্রেণীও অংশগ্রহণ করবে। বিভিন্ন শ্রেণী থাকায় এই সংযুক্ত ফ্রণ্টে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীও থাকবে। কুও মো জো দেখিয়েছেন যে খুব তাড়াতাড়ি এই পার্থক্য বিলোপ করা যাবে না। শ্রমিক শ্রেণীর মতাদর্শ দিয়ে শ্রমিক শ্রেণীর সহযোগী যারা, তাদের অবশ্য শিক্ষিত করে তুলতে হবে। কিন্তু শত্রু হিসেবে দেখলে তাদের চলবে না। সেটা হবে মার্কসবাদ বর্জন করবারই নামান্তর।

সংযুক্ত ফ্রণ্টের ভিতর বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন শ্রেণী থাকলেও, রাজনীতির দিক থেকে—সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার ভিত্তিতে তাদের ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভব হবে। তাছাড়া, সমালোচনা ও আত্মসমালোচনার মাধ্যমে, গণসাহিত্য সৃষ্টির সৃজনীশীল প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে এই ফ্রণ্টের একটা সাধারণ লক্ষ্য গড়ে তোলাও সম্ভব, যে সাধারণ লক্ষ্যটাই হবে বিভিন্ন শ্রেণীর ভেতরকার যোগসূত্র।

—সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আলোচনার জন্য

# ভারতের প্রগতিশীল লেখকদের কর্তব্য সম্বন্ধে খসড়া বিবৃতি

[ ভারতীয় প্রগতি লেখক সংঘের নিখিল ভারত কার্যনির্বাহক সমিতিতে আলোচনার জন্য ]

১। গণতন্ত্র ও শান্তিকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে এক বিরাট ঐক্যবদ্ধ ফ্রণ্ট গড়ে তোলার জন্য ভারতীয় প্রগতি লেখক সংঘ সকল সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও গণতান্ত্রিক লেখককে আহ্বান জানাচ্ছে। জনগণের হিতসাধনই ভারতের প্রগতিশীল লেখকদের মূলমন্ত্র। গত পনের বছর ধরে তাঁরা সর্বদাই শান্তির ও জাতীয় স্বাধীনতার আদর্শকে তুলে ধরেছেন। আজ যখন এশিয়ায় বৈদেশিক শাসনের শেষ ঘাঁটিগুলি ধ্বসে পড়ছে তখন ভারতকে রীতিমতো একটা যুদ্ধ-ঘাঁটিতে পরিণত করার অভিসন্ধি নিয়ে ভারতের মাটিতে গেড়ে বসার জন্য সাম্রাজ্যবাদ পাগলের মত চেষ্টা করছে। আজ তাই এদেশের লেখকদের পক্ষে আরো বেশী করে প্রয়োজন শান্তির ও মুক্তির স্বপক্ষে শুধু ব্যক্তিগতভাবে নয়, যৌথ, ঐক্যবদ্ধ ও নিজেদের সংগঠন মারফত আরো কার্যকরীভাবে লেখনীর শক্তিকে পরিচালিত করা। লেখকদের ও জনগণের ঐক্যই সংস্কৃতির উপর সাম্রাজ্যবাদের সংঘবদ্ধ আক্রমণকে প্রতিহত করতে সক্ষম। প্রগতিশীল লেখকদের প্রাথমিক কর্তব্য নিজেদের সংগঠনকে শক্তিশালী করা এবং তার মধ্যে ভারতের সকল দেশপ্রেমিক লেখককে টেনে এনে তাকে একটি ব্যাপক ও গণভিত্তিমূলক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা।

২। আমাদের দেশের মহৎ লেখকদের কাছ থেকে আমরা জনগণের কল্যাণে লেখনীকে পরিচালিত করার শিক্ষাই পেয়েছি। রবীন্দ্রনাথ ব্রিটিশের সন্ত্রাসবাদী শাসনের বিরোধিতা করেছিলেন এবং প্রতিবাদস্বরূপ নিজের নাইটহুড খেতাবকে বর্জন করেছিলেন। জাপানী যুদ্ধবাদীদের মানবতার শত্রু বলে নিন্দা করে রবীন্দ্রনাথ কোটি কোটি এশিয়ার জনগণের অন্তরের কথাই উচ্চারণ করেছিলেন।

সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী প্রচারকে মেনে নিতে অস্বীকার করে রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় ও সোভিয়েট জনগণের মধ্যে চিরন্তন মৈত্রীর স্বপক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন। প্রেমচন্দ্ সারা জীবন ধরে ভারতীয় কৃষকদের দুঃখের ছবি এঁকেছিলেন। বিদেশী প্রভুদের স্বার্থে যেসকল লেখক জাতিগত ও সাম্প্রদায়িক ঘৃণায় ইন্ধন যোগাতেন প্রেমচন্দ তাদের তীব্রভাবে নিন্দা করেছিলেন। অতীতের মহৎ লেখকদের গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যকে রক্ষা করা ও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং আঙ্গিকের দিক থেকে জাতীয় এবং বিষয়বস্তুর দিক্ থেকে গণ-তান্ত্রিক এমন এক সংস্কৃতি গড়ে তোলার জন্য পথ প্রস্তুত করা সকল দেশপ্রেমিক লেখকদের মহত্তম কর্তব্য ও অলঙ্ঘনীয় অধিকার।

৩। ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক তৃতীয় মহাযুদ্ধের প্রস্তুতির বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক লেখকগণ পৃথিবীর সর্বত্র বিশ্বশান্তির জন্য সংগ্রাম করছেন। কোটি কোটি শান্তির সৈনিকদের সমাবেশে তাঁরা স্থান গ্রহণ করছেন। সোভিয়েট ইউনিয়ন, চীন, ফ্রান্স ও অন্যান্য দেশের লেখকগণ শান্তির ও মানব কল্যাণের মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত করার জন্য গৌরবের সঙ্গে নিজেদের কর্তব্য পালন করছেন। ভারতের প্রগতিশীল লেখকগণ ঘোষণা করছেন: তাঁরা এই সকল গণতান্ত্রিক লেখকদের পাশে এসে দাঁড়াবেন এবং তাঁদেরই মহৎ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে জাতীয় স্বাধীনতার ও শান্তির উদ্দেশ্যে আত্মনিয়োগ করবেন।

৪। মত প্রকাশের ও সম্মেলনের স্বাধীনতা প্রত্যেক নাগরিকের মৌলিক অধিকার। লেখকের ও শিল্পীর স্বাধীনতা যথেচ্ছাচারিতার জন্য ব্যহত হলে সাংস্কৃতিক উন্নতি সম্পূর্ণ অসম্ভব হয়ে পড়ে। আজ ভারতে মত প্রকাশের ও সম্মেলনের স্বাধীনতা প্রতিনিয়তই ক্ষুন্ন হচ্ছে। সংবাদপত্র ও সাময়িকীগুলির উপর নিষেধাজ্ঞা জারী হচ্ছে। লেখক ও শিল্পীদের গ্রেপ্তার ও নির্বিচারে আটক করা হচ্ছে। 'প্রগতি লেখক সংঘ' সকল স্বাধীনতাকামী ও সত্যনিষ্ঠ লেখককে আহ্বান করছে, জনগণের নাগরিক অধিকারের উপর হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে তাঁদের কণ্ঠ ধ্বনিত হোক্ ও লেখনী পরিচালিত হোক্। নাগরিক অধিকারের জন্য সংগ্রামে দেশের সমগ্র জনগণ যোগদান করবেন—কেননা এই লড়াইয়ের ভিতর দিয়ে তাঁদেরই স্বার্থ এবং স্বাধীন, শান্তিপূর্ণ ও নিরুপদ্রব জীবনযাপনের জন্য তাঁদের ঐকান্তিক ইচ্ছাই প্রতিফলিত হচ্ছে। এই লড়াই জয়ী হবেই কেননা জনগণের ঐক্যবদ্ধ ইচ্ছাকে কোন শক্তি রোধ করতে পারে না।



৫। শুরু থেকেই সাম্রাজ্যবাদ পরাধীন জাতির ভাষা ও সংস্কৃতির ধ্বংস-সাধনে নিযুক্ত। একদা সে এই কপটোক্তি করত যে এশিয়ার ও আফ্রিকার অনুন্নত কালা আদমিদের সভ্য করে তোলাই তার 'ব্রত' এবং শ্বেত মানবের ভারবহনের নামে চলত তার স্বৈরাচারী শাসন। আজ অধিকতর কপটতার সহিত সে পরাধীন জাতিগুলিকে 'স্বাধীনতা' দেওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছে এবং ব্যাপক নরহত্যার অস্ত্র প্রয়োগ করে বহুতর 'হিরোশিমা' ও 'নাগাসাকি' অনুষ্ঠিত করার চক্রান্তে লিপ্ত থেকেও সে শান্তির ও সহযোগিতার বুলি আওড়াচ্ছে। প্রগতিশীল লেখকগণ সাম্রাজ্যবাদের এই সকল ভণ্ডামির মুখোস খুলে দেবেন। ভারতীয় জনগণ ভাল করেই জানেন যে সাম্রাজ্যবাদীদের ও তাঁদের অনুগত ভৃত্যদের এশিয়া থেকে যদি চিরদিনের মতো বিতাড়িত করা যায় তাহলেই পৃথিবীতে চিরস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। জনসাধারণকে প্রতারিত করার জন্য ও দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ রাখার জন্য সাম্রাজ্যবাদ নানারূপ সমাজবিরোধী নীতির আশ্রয় নেয়, যথা, "আর্টের জন্যই আর্ট" এবং ধর্মের পুনরভ্যুত্থান ( রিভাইভ্যালিজম )। সাম্রাজ্যবাদ লেখকদের এই বলে উপদেশ দেয়, "জনসাধারনের জন্য লিখো না, তাতে করে আর্টের অবনতি ঘটবে এবং তোমার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নষ্ট হবে।" প্রগতিশীল লেখকগণ জনসাধারণের কল্যাণসাধনে বিমুখ হয়ে সাম্রাজ্যবাদের কৃতজ্ঞতাভাজন নিশ্চয়ই হবেন না। "তোমার ধর্মই শ্রেষ্ঠ, অন্য ধর্মগুলি বর্বরতার পরিচায়ক। হিন্দু ও মুসলমানে মিলন কি করে সম্ভব যখন তাদের সংস্কৃতি সম্পূর্ণ পরস্পর-বিরোধী।" এই সকল বুলির দ্বারা সাম্রাজ্যবাদ সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ধর্মকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চায় এবং জনগণের মধ্যে দাঙ্গা ও ভ্রাতৃযুদ্ধ বাধানোর হীন উদ্দেশ্যে ধর্মান্দোলনকে ব্যবহার করতে চায়। অতীতমুখী ধর্মান্দোলন স্পষ্টতই সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থসেবী ধারা, এই কারণে প্রগতিশীল লেখকগণ তার বিরুদ্ধে লড়াই করবেন। ধর্মবিশ্বাস পৃথক হওয়া সত্ত্বেও মানুষ পরস্পরের সহিত শান্তিতে বাস করবে এবং অপরের ধর্মবিশ্বাসকে সহ্য করবে, প্রগতিশীল লেখকগণ এই নীতিকেই তুলে ধরবেন। তাঁরা চেষ্টা করবেন সাধারণ লোকের জীবনের একতা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার একতার ভিত্তিতে গণভাষা ও গণসংস্কৃতিকে গড়ে তুলতে।

৬। ভারতীয় জনসাধারণকে যুদ্ধচক্রান্তের মধ্যে টেনে আনার জন্য ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতীয় জনগণ ও তাঁদের চীনা ও সোভিয়েট প্রতিবেশী-দের মধ্যে পারস্পরিক সন্দেহ ও অবিশ্বাস সৃষ্টি করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে।

ভারতে প্রতিক্রিয়াশীলদের সোভিয়েট-বিরোধী ও চীন-বিরোধী অপপ্রচারের মূল লক্ষ্য আমাদের প্রতিবেশীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে জনসাধারণের মনকে প্রস্তুত করা। প্রগতিশীল লেখকগণ এই অপপ্রচারের তীব্র নিন্দা করছেন এবং সম্মিলিত জাতি সংঘের চার্টারের মূল নীতি অবলম্বন করে তাঁরা এই অপপ্রচারের প্রতিরোধ করবেন।

৭। আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকই চাষী। সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ত-তন্ত্র তাঁদেরকে দাবিয়ে রেখেছে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দৈন্যের মধ্যে। তথাপি তাঁদের হাতে রয়েছে লোক-সংস্কৃতির অমূল্য সম্পদ এবং প্রগতিশীল লেখকদের কর্তব্য এই লোকসংস্কৃতির কাছ থেকে শিক্ষালাভ করা এবং কৃষক সংস্কৃতিকে আরো উচ্চতর পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া। লোক-কবিদের সহিত বরাবর আমরা নিবিড় সম্পর্ক স্থাপিত করে এসেছি এবং 'প্রগতি লেখক সংঘের' মধ্যে সাংগঠনিক ভাবে তাঁদের নিয়ে আসতে পারলে গণ-সংস্কৃতির দ্বারা সমৃদ্ধ হয়ে আমাদের শক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে।

৮। 'প্রগতি লেখক সংঘে'র নীতি এই যে বিভিন্ন জাতিকে ও জনগণকে নিজ নিজ ভাষার ও সংস্কৃতির বিকাশসাধনের পূর্ণ সুযোগ দেওয়া হবে। তাঁরা এই নীতি সমর্থন করেন যে কোন বিশেষ জাতির বা জনসাধারণের উপর তাঁদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন ভাষা চাপিয়ে দেওয়া চলবে না, সকল জাতির ও জনগণের নিজ নিজ ভাষার ও সংস্কৃতির উন্নতি সাধন করার পূর্ণ অধিকার আছে এবং কোন জাতির বা গোষ্ঠীর স্বার্থে অপর কোন ভাষা বা সংস্কৃতিকে দমন করা অন্যায়। ভারতের সমগ্র জনগণের চিরস্থায়ী ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে একমাত্র স্বেচ্ছা-মিলনের ভিত্তিতে যখন সকল ভাষাকে কথায় এবং কার্যত সমানাধিকার দেওয়া হবে। প্রগতিশীল লেখকগণ এইরূপ ঐক্যের জন্য চেষ্টা করবেন এবং কোন জন সমূহের উপর তাঁদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অপরের ভাষাকে চাপিয়ে দেওয়ার বিরোধিতা করবেন।

৯। প্রগতিশীল লেখকগণ অতীতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে মেনে চলেন। তাঁরা এই ঐতিহ্যের স্বপক্ষে লড়াই করেন যাতে প্রতিক্রিয়াশীল লেখকদের হাতে এই ঐতিহ্য বিকৃত না হয় এবং অতীত শিল্পের ও সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কীর্তিগুলিকে জনসাধারণের হাতে পৌঁছে দেওয়ার জন্য তাঁরা চেষ্টা করেন। সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধচক্রান্ত আমাদের দেশের বিশ্ববিশ্রুত শিল্পকীর্তি, প্রাচীন ঐতিহাসিক সৌধ, প্রাচীন পুঁথি এবং এই ধরনের দুর্লভ শিল্পসম্পদকে বিপন্ন করে তুলছে। শিল্প-



সাহিত্যের বিরাট কীর্তিগুলিকে বাঁচানোর জন্য, সামাজিক ও রাজনৈতিক মতের বিভিন্নতা সত্ত্বেও সকল প্রগতিশীল লেখক একত্রে কাজ করবেন।

১০। 'ভারতীয় প্রগতি লেখক সংঘ' পাকিস্তানের প্রগতিশীল লেখকদের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করছে এবং প্রতিক্রিয়াশীলদের ঘৃণাপ্রচারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সাম্প্রদায়িক মৈত্রীর ও শান্তির জন্য তাঁদের নির্ভীক সংগ্রামকে অভিনন্দন জানাচ্ছে। ভারতীয় লেখকদের কর্তব্য পাকিস্তানের প্রগতিশীল লেখকদের সঙ্গে ঐক্যকে দৃঢ়তর করা কেননা আমরা যদি ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করি তাহলেই স্বাধীনতার ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তকে পরাজিত করতে পারব।

১১। জনগণের হিতসাধন ও সাম্রাজ্যবাদী দাসত্ব থেকে মুক্তিলাভ—এই দুটি মূল লক্ষ্যই সকল সত্যনিষ্ঠ লেখককে এক শিবিরে ঐক্যবদ্ধ করতে পারে এবং অবশ্যই করবে। বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যা সম্বন্ধে মতভেদ কিছুকাল ধরে নিশ্চয়ই চলতে থাকবে। বন্ধুভাবাপন্ন আলোচনা ও সমালোচনার দ্বারা এই সকল মতান্তরের বাধা ক্রমশই বিদূরিত হবে। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সকল গণতান্ত্রিক লেখকদের ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট গঠনের পথে এই সকল মতভেদকে প্রতিবন্ধক হিসাবে থাকতে দেওয়া কোনমতেই চলতে পারে না। এই ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করার জন্য 'প্রগতি লেখক সংঘ' অন্যান্য লেখক সংঘের সহিত এবং কোনও সংঘের সহিত সংশ্লিষ্ট নন্ এমন ব্যক্তিগত লেখকদের ও সাংস্কৃতিক কর্মীদের সহিত একযোগে কাজ করবে।

১২। এশিয়ায় সাম্রাজ্যবাদী শাসনের দিন ফুরিয়ে এসেছে। বৈদেশিক শাসনের ও সাম্রাজ্যবাদী চালবাজির দীর্ঘ অধ্যায় সমাপ্ত হতে চলেছে। পৃথিবীর জনগণ এবং তাঁদের সঙ্গে ভারতের জনগণও দাসত্ব ও যুদ্ধ চান্ না। যুদ্ধ ও বর্বরতা, মৃত্যু ও তিমিরের শক্তির চেয়ে শান্তি ও সংস্কৃতি, জীবন ও আলোকের শক্তি বহুগুণ বলশালী। তরবারির শক্তির চেয়ে লেখনীর শক্তি দুর্জয়তর। আসুন, আমরা এই শক্তিকে জনগণের হিতার্থে ব্যবহার করি। আসুন, আমরা দেশের জনসাধারণের স্বাধীন ও শান্তিপূর্ণ জীবন যাত্রার অভিযানকে জয়ী করার জন্য সকল দেশপ্রেমিক লেখককে মিলিত করি। শান্তির ও গণসংস্কৃতির অভিযান অপরাজেয়।

# বিশ্বশান্তি কংগ্রেসের ডাক

বিশ্বশান্তি কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির ষ্টকহোল্‌ম্ অধিবেশন থেকে ছুনিয়ার শান্তিকামী মানুষের কাছে "ব্যাপক হত্যালীলা ও আক্রমণের হাতিয়ার হিসাবে আণবিক অস্ত্রের প্রয়োগ বিনাসর্তে নিষিদ্ধ" করার ও আণবিক অস্ত্রের প্রথম প্রয়োগকারীকে মানবতার চরম শত্রু ও যুদ্ধাপরাধী বলে গণ্য করার এক আহ্বান-পত্র এসে পৌছেছে। সেই আহ্বানপত্রে যাঁরা সাড়া দিয়েছেন তাঁদের প্রথম সারিতে এসে দাঁড়িয়েছেন ছুনিয়ার শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবীরা। এঁদের মধ্যে আছেন জোলিও কুরী, জে-ডি-বার্নাল, ফাদায়েভ, ইলিয়া এরেনবুর্গ, টমাস মান, পাবলো নেরুদা ও আরও অনেকে। আমাদের দেশেও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে এ-বিষয়ে প্রচুর সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। ইতিমধ্যেই যাঁরা কুরী ও টমাস মানের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন তাঁদের মধ্যে আছেন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডাঃ মেঘনাদ সাহা ও ডাঃ মুল্‌করাজ আনন্দ, কিষণ চন্দর, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি। এ-ছাড়া, পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন স্কুল ও কলেজের শিক্ষক, বিভিন্ন দৈনিক ও সাময়িক পত্রিকার সম্পাদক, রেডিও ও ফিল্‌ম অভিনেতা, সঙ্গীত শিল্পী, পরিচালক ও প্রযোজকদের মধ্যে থেকেও প্রচুর উৎসাহ দেখা গেছে। বাংলাদেশের প্রায় শতাধিক বুদ্ধিজীবী ইতিমধ্যে এই ডাকে সাড়া দিয়েছেন।

আজ যখন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে পশ্চিম ইওরোপের প্রায় সবগুলি সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র ও তাদের তাঁবেদারেরা পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় কোরিয়ার স্বাধীনতা ও ঐক্য আন্দোলনের উপর প্রত্যক্ষ রক্তক্ষয়ী আক্রমণ শুরু করেছে, চীনের গণরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদ প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ করেছে, ভিয়েৎনাম ও ফিলিপাইনে দেশপ্রেমিকদের বিরুদ্ধে তারা মারণাস্ত্র সরবরাহের ঢালাও বন্দোবস্ত করেছে তখন এই সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধাপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করে দেবার দায়িত্ব ভারতবর্ষের ও বাংলাদেশের জনসাধারণ ও বুদ্ধিজীবীদেরও কম নয়। বিশেষ ক'রে ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক এশিয়ার বিপন্ন স্বাধীনতা-সংগ্রাম ও সেই সংগ্রামে ভারত গবর্নমেন্টের ক্রমপ্রকাশ্য বিরোধী ভূমিকার ফলে তাঁদের এই দায়িত্ব আজ সমধিক। এই পটভূমিতে এই



শান্তি আন্দোলনের সম্ভাবনার কথা মনে রাখলে একথা বলতেই হবে যে বাংলাদেশে ইতিমধ্যে কাজ যেটুকু এগিয়েছে, সেটা কিছুই নয়। মাত্র তিন সপ্তাহের মধ্যে শ্রমিক, কৃষক, বুদ্ধিজীবী, কেরানি, ব্যবসায়ী প্রভৃতির কাছ থেকে যে সই সংগৃহীত হয়েছে তার সংখ্যা কুড়ি হাজারের কিছু বেশী। এ থেকেই বোঝা যায়, এ-বিষয়ে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান যদি উদ্যমের সঙ্গে এগিয়ে যান, তবে অভূতপূর্ব সাফল্য আমরা অর্জন করতে পারি। 'পরিচয়' বাংলার সংস্কৃতিকামীদের দলমত নির্বিশেষে এই কাজে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে আহ্বান জানাচ্ছে এবং তাঁদের সাহায্য করার জন্য বিশ্ব-শান্তি কংগ্রেসের আবেদনপত্রটি 'পরিচয়ে'র পাতায় ছাপাচ্ছে। আবেদনপত্রে সই করে বিশ্ব-শান্তি কংগ্রেসের বাঙলা কমিটির অফিসে, অথবা 'পরিচয়ে'র অফিসে ফেরৎ দিতে হবে।

## আবেদনপত্র

"আমরা দাবি করি, জনসাধারণের ব্যাপক হত্যালীলা ও আক্রমণের হাতিয়ার হিসাবে আণবিক অস্ত্রের প্রয়োগ বিনাসর্তে নিষিদ্ধ করা হোক।

"আমরা দাবি করি, এই সিদ্ধান্ত কার্যকরী করিবার জন্য কঠোর আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হোক।

"আমরা মনে করি, যে সরকার অন্য কোন দেশের বিরুদ্ধে প্রথম আণবিক অস্ত্র প্রয়োগ করিবে সেই সরকার মানবতার চরম শত্রু, এবং তাহাকে যুদ্ধাপরাধী বলিয়া গণ্য করা হইবে।

"পৃথিবীর প্রত্যেকটি শুভবুদ্ধিসম্পন্ন লোকের নিকট এই আবেদন পত্রে স্বাক্ষর করিবার জন্য আমরা আহ্বান জানাইতেছি।"

## আন্তর্জাতিক খ্যাতনামা স্বাক্ষরকারীগণ

ফ্রেডারিক জোলিও কুরী—পদার্থবিদ, নোবেল প্রাইজ প্রাপ্ত, বিশ্ব-শান্তি কংগ্রেসের স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান (ফ্রান্স)।

জে, রোগী—বিশ্বশান্তি কংগ্রেসের স্থায়ী কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান, প্রাক্তন সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল, আইনজীবী (ইউ, এস)।

আলেকজাণ্ডার ফাদায়েভ — লেখক, চেয়ারম্যান বিশ্ব-শান্তি কংগ্রেসের স্থায়ী কমিটি (ইউ, এস, এস, আর)।

অধ্যাপক জে, ডি বার্নাল — ভাইস চেয়ারম্যান বিশ্ব-শান্তি কংগ্রেসের স্থায়ী কমিটি।

পিয়াট্রো নেনী — ভাইস চেয়ারমান বিশ্ব-শান্তি কংগ্রেসের স্থায়ী কমিটি, ইটালিয়ান সোসালিষ্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক (ইটালী)।

লুইস সেইল্যান্ট — ভাইস চেয়ারমান বিশ্ব-শান্তি কংগ্রেসের স্থায়ী কমিটি সাধারণ সম্পাদক ডব্লিউ, এফ, টি, ইউ (ফ্রান্স)।

এমি সিয়াও—লেখক, চেয়ারম্যান, চীনা শান্তি কমিটি (চীন)।

জেমস্ এণ্ডিওকোট—চেয়ারম্যান, কানাডা শান্তি কংগ্রেস।

ইলিয়া এরেনবুর্গ,—লেখক (ইউ, এস, এস, আর)।

ডাঃ হিউলেট জনসন—ডিন অফ কাণ্টারবেরী ( বৃটেন )।

নাম ..............................................................

ঠিকানা ..............................................................

পেশা ..............................................................

মন্তব্য—

সম্পাদক রবীন্দ্র মজুমদার কর্তৃক কলা প্রেস, ৬২-এ ফ্রি স্কুল স্ট্রীট থেকে মুদ্রিত
৩০৯ বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা থেকে প্রকাশিত।